ISSN 1813-0372

বর্ষ : ৮ সংখ্যা : ২৯
জানুয়ারী-মার্চ ঃ ২০১২

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ৮, সংখ্যা : ২৯

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জানুয়ারী-মার্চ : ২০১২

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮, ০১৭১২-০৬১৬২১
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
web: www.ilrcbd.org

বিপণন বিভাগ : ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : আন-নূর

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 100 US $ 5

সূচিপত্র

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৮, সংখ্যা : ২৯
জানুয়ারী-মার্চ : ২০১২

সম্পাদকীয়

ধর্ম সংস্কৃতি ও আত্মমর্যাদাবোধের আলোকে বাংলাদেশের আইন

বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ ইসলামে বিশ্বাসী। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান বা প্রকৃত অর্থেই একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। কেননা, একজন মানুষকে তার জীবনের যাবতীয় দিক সম্পর্কে পরিপূর্ণ আদর্শ নীতিমালা, বিধান ও সমাধান দেয়ার যোগ্যতা থাকলেই তাকে ধর্ম বলা হয়। ইহকাল, পরকাল, স্রষ্টা, বিধাতা, পালনকর্তা, ঐশী নির্দেশনা, নবী, রসূল, ব্যক্তি, সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র, দৈহিক, আধ্যাত্মিক, অর্থ, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য, জ্ঞান ও প্রযুক্তি তথা জীবনের সকল অঙ্গন ও আঙ্গিক শুধু ছুয়ে যাওয়া নয়; গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার কাজ ধর্মের। এ অর্থে ইসলামই যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য ধর্ম। বাংলাদেশের মানুষ ভাগ্যবান যে তারা এ ধর্মের অনুসারী। বাংলাদেশের সংবিধানে সকল ধর্মের নাগরিকদের স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার স্বীকৃত। নাগরিকদের ধর্মীয় অধিকার বিশ্ব মানবাধিকারেরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ দেশের সংবিধান কোনো ধর্মীয় বিধানকে চ্যালেঞ্জ, বাধাগ্রস্ত বা রহিত করেনা। পঞ্চদশ সংশোধনীর পর বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতিরূপে ধর্মনিরপেক্ষতা পুনস্থাপিত হয়েছে। যার মর্মার্থও সরকারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্মহীনতা নয় বরং ধর্মপালনের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের পক্ষপাতহীন সম-অধিকার। সকল ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ আচরণ। সংবিধানের অপরিবর্তনীয় নীতিতাত্ত্বিক অংশে 'রাষ্ট্রধর্ম' শিরোনামে ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্বসহ উল্লেখিত। অলিখিত সমাজবাস্তবতায় এবং গণতন্ত্রের মূল প্রেরণা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচনায় প্রায় ৯০ ভাগ মানুষের আচরিত ধর্মরূপে ইসলাম এ দেশের অন্যতম প্রধান উপাদান। একে অস্বীকার করে, অবজ্ঞা করে, উপেক্ষা করে এবং এর সাথে বৈরিভাব পোষণ করে যত কাজ, যত সিদ্ধান্ত, যত নীতি, বিধি-বিধান ও আইন করা হবে সবই প্রকৃতি বিরোধী বিবেচিত হতে বাধ্য। মানুষের স্বাভাবিক জীবনবোধ

ও প্রকৃতিগত ভাবধারা বিরোধী কোনো আইন দুনিয়াতে চলতে পারেনা। কৃত্রিম উপায়ে জোর করে চালানো হলেও তার ফল ভালো হয় না। এতে শৃংখলা বিনষ্ট হয়। জীবন জগত মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার ভয়াবহ ক্ষতি সাধিত হয়। মানুষের মধ্যকার চিরন্তন নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও আচরিত অভ্যাস লংঘন করে মুক্তচিন্তা মানবাধিকার বা প্রগতিশীলতার নামে যত যাই করা হয়েছে বা হচ্ছে, এসবের শেষ ফল কোনো বিচারেই ভালো হতে পারেনা। ভালো হয়নি, হচ্ছে ও না।

গত বছরের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সেদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন যে ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়েছেন, তা পাশ্চাত্য সভ্যতার গন্তব্য ও মানবজাতির ভবিষ্যত বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশ দিতে যথেষ্ট। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকার নৈতিকভাবে নারী পুরুষের সকল প্রকার যৌন সম্পর্ক, অভ্যাস বা রুচিকে সর্বাত্মক সমর্থন দিয়ে যাবে। এক লিঙ্গে সমকাম, উভলিঙ্গে সমকাম, নারী সমকাম, পুরুষ সমকাম, একত্রবসবাস ইত্যাদি সকল ধরনের যৌনতাই আমরা সমর্থন করি। বিশ্বব্যাপী লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, হোমোসেক্সুয়াল নারী পুরুষকে তাদের অবাধ যৌন সংস্কৃতি নির্বিঘ্ন করার কাজে ৩০ লক্ষ ডলার তহবিল গঠনের কথাও মিসেস ক্লিনটন ঘোষণা করেন।

পাশ্চাত্যের একাধিক রাষ্ট্রে সমলিঙ্গে বিয়ে ও সমকাম আইনসিদ্ধ। পশ্চিমা সমাজে বিয়ে বহির্ভূত যৌনজীবন স্বীকৃত এবং ওখানকার মানুষ এতে অভ্যস্ত। আঠারো বছর তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই অসংখ্য শিশুর যৌন অভিজ্ঞতা সে সমাজে অস্বাভাবিক কিছু নয়, যেমন কুমারী মায়ের সংখ্যা সেখানে গগনচুম্বী। তা ছাড়া প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া মানে তো সে সমাজে যথেচ্ছাচারের লাইসেন্স পেয়ে যাওয়া। গার্লফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ড, সেক্সট্যুর ও ডেটিং সেখানে ডালভাত। বিবাহ বিচ্ছেদ, সংসারবিমুখতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা অস্বীকারের প্রবণতা দিনদিনই সেখানে বাড়ছে। আশংকাজনক হারে পরিলক্ষিত হচ্ছে কুমারী মায়েদের অনাথ শিশু, শিশু মায়েদের অপুষ্ট রুগ্ন সন্তান, পিতৃপরিচয়হীন বিশাল প্রজন্ম, কন্যাকে সম্ভোগে অভ্যস্ত পিতা। ক্ষেত্র বিশেষে যাদের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ১৮, ৫৬ ও ১৭ ভাগ। পরিবার প্রথা ও বিবাহের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানটি এখন অনেকটাই অস্তিত্ব সংকটে। মরণব্যাধি এইডস মুখব্যাদান করে তাড়া করছে পাশ্চাত্যের মানুষকে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ, যৌনতা মাদক অভাববোধ লোভ ও নিষ্ঠুরতার করাল গ্রাসে বিপন্নপ্রায়। হতাশা, বিষন্নতা ও সহিংসতার তুষের আগুনে নীরবে জ্বলছে পশ্চিমাবিশ্ব। সে তুলনায় প্রাচ্যে

আমরা অনেকাংশে ভালো আছি। অঞ্চল হিসাবে আমরা ধর্মপ্রবণ। এখানকার সংস্কৃতি মানবিক ও পরিচ্ছন্ন। পবিত্রতা নীতি-নৈতিকতা এখানে এখনও স্বীকৃত। দেশ হিসাবে বাংলাদেশ চমৎকার। এখনো এখানে পিতা কন্যাকে ভোগ করার কথা ভাবেনা। ছেলের হাতে মায়ের যৌন লাঞ্ছনার কথা কল্পনাও করা যায়না। অবশ্য শিশুদের মধ্যে যৌনতা, বিবাহ বহির্ভূত যৌনজীবন, কুমারী মাতা, পিতৃপরিচয়হীন সন্তান, বিকৃত যৌনাচার প্রভৃতি প্রচলনের জন্য পশ্চিমারা আমাদের সমাজকেও টার্গেট করে দীর্ঘদিন ধরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এসব আপদ তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলায়, প্রাচ্যের জনজীবনকেও তাদের কেউ কেউ চাইছে বিষিয়ে দিতে। পশ্চিমাদের নাপাক গলিজ এ দেশেও আমদানি হচ্ছে নানাভাবে নানা উপায়ে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, উভয় পন্থায়ই প্রতিষ্ঠিত শৃংখলা ও শান্তিময়তাকে আঘাতে আঘাতে বিচূর্ণ করার প্রয়াস চলছে।

এ পর্যায়ে বাংলাদেশের নেতৃবর্গকে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। আইন রচয়িতাদের প্রজ্ঞা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে। জনগণের জীবনধারা, রীতি, ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি ও আত্মমর্যাদাবোধের আলোকে আইন বিধান নীতিমালা এবং বিধি প্রণয়ন করতে হবে। আন্তর্জাতিক আইন, বৈশ্বিক নীতিমালা ও পশ্চিমাদের নির্দেশনা বিনা বাক্য ব্যয়ে কিছুতেই মেনে নেয়া যাবে না। কারণ, তাদের জীবনবোধ সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতা ভিন্ন। ধর্ম ও নৈতিকতা নগণ্য। মূল্যবোধ বিপন্ন। নিশর্তভাবে তাদের পদরেখা অনুসরণ করা যাবেনা। করলে বাংলাদেশের সর্বনাশ হবে। ৯০ ভাগ মানুষের দীন ঈমান নষ্ট হবে। জীবনের সুখ বিলুপ্ত হবে। এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও মানবিকতার দিক দিয়ে বিশ্বের অন্যতম সুখী দেশ। এ সুখ বিদা নেবে। ষোল কোটি মানুষ নিয়ে এ দেশ জাহান্নামে পরিণত হবে। নেতৃবর্গ যে কোনো মূল্যে এদেশের ধর্ম, নৈতিকতা, পবিত্র অনুভূতি ও অতুল মূল্যবোধ ধরে রাখুন। এ হচ্ছে এ সময়ের সেরা অনুরোধ। জাতীয় বিবেকের আহবান।

ঔপনিবেশিক আমলের অনুকরণে বাংলাদেশে বিবাহ বহির্ভূত যৌন মিলন এখনো বৈধ। প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষ পরস্পর সম্মতিতে একত্রবাস এ দেশে আইনত নিষিদ্ধ নয়। কেন, মানুষের সৃষ্টিকর্তা তো এটি নিষিদ্ধ করেছেন। এ দেশে একজন নারীকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা দোষের নয়, কিন্তু তাকে বিয়ে করা ক্ষেত্র বিশেষে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। নারী পুরুষের অনৈতিক যৌনমিলনকে সামাজিক ভাবে নিন্দনীয় মনে করা হয় কিন্তু আইন এখন এসবকে পেশা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। একে বলা হচ্ছে 'সেক্সওয়ার্ক'। 'যৌনকর্মী' একজন পেশাজীবি মানুষের বৈধ উপাধি। জনগণকে পবিত্র জীবনে উদ্বুদ্ধ না করে বলা হচ্ছে নিরাপদ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার কথা। অর্থাৎ

যেখানে সেখানে যৌন সম্পর্ক করা যেতে পারে তবে কেবল তা নিরাপদ হলেই চলবে। নৈতিকতার শিক্ষা প্রচার না করে তথাকথিত নিরাপদ যৌনতার কালচার চালু করা হচ্ছে। বিয়ে শাদীর ব্যবস্থা সহজ ও নির্বিঘ্ন করার চিন্তা না করে বাল্যবিবাহ রোধের ব্যানারে যে কার্যক্রম চলছে তার ভারসাম্য নিয়ে নীতিনির্ধারকদের আরো চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে বলে চিন্তাশীল মহল মনে করেন। দরিদ্র, অনাথ, অভিভাবকহীন, সামাজিকভাবে অরক্ষিত, বয়সের তুলনায় অধিক বর্ধনশীল, সহায়সম্পত্তি সুরক্ষার বিশেষ প্রয়োজন কিংবা যৌন সচেতনতার ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেও কোনো ছেলেমেয়ের বিয়ে ১৮ বা ২১ বছরের আগে হতে পারবেনা, এমন আইন কতটা জীবনঘনিষ্ট। এ নিয়েও যেন সংশ্লিষ্টরা নতুন করে ভাবেন। বিশেষ ক্ষেত্রে কি এ আইন শিথিলযোগ্য ও নমনীয় করার প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় আছে?

মিডিয়ায় প্রায় সময়ই দেখা যায়, বাল্যবিবাহ রোধে পুলিশ, প্রশাসন ও সুশীল গোষ্ঠী মারমুখি হয়ে ঝাপিয়ে পড়ছে; বিয়ের আসর থেকে বর-কনের বাবা-মাকে গ্রেফতার করে হাজতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কষ্ট করে আয়োজন করা বিয়ে অনুষ্ঠান তছনছ করে দেয়া হচ্ছে। দু'টি পরিবারের আর্থ-সামাজিক শৃংখলা গুড়িয়ে দিয়ে তাদের পথে বসিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রভাবশালী, বখাটে কিংবা বদ পুরুষদের হাতে লাঞ্ছিত নারীরা দ্বারে দ্বারে ঘুরেও বিচার পাচ্ছেনা। ধর্ষিতার পরিবার ভয়ে টু শব্দটিও করতে পারছেনা। থানায় গিয়ে মামলা করার সাহস পাচ্ছেনা। মিডিয়ায় বিষয়টি এলেই কেবল মানুষ শুনতে পাচ্ছে। পুলিশ বলছে, বিষয়টি আমাদের জানা নেই। কেউ মামলা বা অভিযোগ করেনি। অথচ বাল্যবিবাহ রোধে ডিসি, এসপি, ইউএনও, ওসি, দারোগা, মহিলা ও সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা ইত্যাদি বহু দায়িত্বশীলের একযোগে ছুটে যাওয়ার ঘটনা অহরহই শোনা যায়। নেতৃবর্গের এসব নিয়েও ভাবতে হবে। সর্বোপরি বাংলাদেশ যেসব আইন দিয়ে চলবে এর প্রত্যেকটিই যেন দেশটির প্রায় ৯০ ভাগ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, জীবনবোধ ও প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হয় সেদিকে গভীর দৃষ্টি রাখতে হবে।

-উবায়দুর রহমান খান নদভী

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮, সংখ্যা-২৯
জানুয়ারী-মার্চ : ২০১২

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান*

[সারসংক্ষেপ : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ হলো আল্লাহ্ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাদেরকে তিনি সবচেয়ে বেশি সম্মান এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করেছেন। জন্মগতভাবে মানুষ এ মর্যাদা অধিকারী। মানব সমাজের অর্ধাংশ নর এবং অর্ধাংশ নারী। নর-নারী একে অপরের উপর নির্ভরশীল। যে কোন একজনকে বাদ দিয়ে মানব সমাজ শুধু অসম্পূর্ণই নয়, এর অস্তিত্বই অসম্ভব। অতএব মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ইসলামের ঘোষণা নর ও নারী উভয়ের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য। মানবিক সম্মান ও মর্যাদার বিচারে নারী ও পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। নারীকে শুধু নারী হয়ে জন্মাবার কারণে পুরুষের তুলনায় হীন ও নীচু মনে করা অজ্ঞতা। তবে নারী হোক বা পুরুষ হোক, প্রত্যেকেই আল্লাহ্ প্রদত্ত এই সম্মান ও মর্যাদাকে তার নিজের বাস্তব চরিত্র ও কাজ কর্মের মাধ্যমেই রক্ষা করতে হবে। এ প্রবন্ধে নারীর প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা, অসম্মান ও সহিংস আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।]

সহিংসতার পরিচয়

বাংলা অভিধানে সহিংসতা বলতে বোঝায় 'হিংসাযুক্ত, হিংসাত্মক', ইংরেজীতে বলা হয় Violent[১]. 'আরবীতে বলা হয় বুগদ্ بغض এবং হাসাদ حسد। হিংসা দ্বারা মানুষের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "শয়তান তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায়"।[২] রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "হিংসা মানুষের আমলকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয় যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে দেয়"। অপর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "মুমিন ব্যক্তি ভালো কাজ করার জন্য প্রতিযোগিতা করে। আর

---

*. প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

১. *Samsad English-Bengli Dictionary*, Kolkata : Sahitya Samsad Pvt Ltd, Fifth Edition, 2006, P. 1272; *Oxford Dictionary Of contemporary English*, Dhaka : Network Printers, New Edition, 2006, P. 870.

২. আল-কুরআন, ৫ : ৯১ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

মুনাফিক ব্যক্তি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে"।[৩] হিংসা থেকে সহিংসতার জন্ম। এই হিংসা ও সহিংস কর্মকাণ্ড ইসলামে নিষিদ্ধ।

নারীর প্রতি সহিংসতা

নারীর প্রতি সহিংসতা বলতে নারীর প্রতি হিংসাত্মক আচরণকে বোঝানো হয়েছে। সহিংসতার অনেক কারণ থাকতে পারে। আধুনিক বিশ্ব প্রেক্ষাপটে নারী অধিকার নিয়ে নিরন্তর আলোচনা চলছে। তাদের কি প্রাপ্য, কেন তারা তা পাচ্ছে না এটি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য প্রথমে যা প্রয়োজন তা হলো তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করা। এখন দেখতে হবে, আসলে ইসলামে নারীকে কি অধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং সেখানে সহিংসতার কোন কিছু রয়েছে কিনা?

জাহিলী যুগে বিভিন্ন সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতা

জাহিলী যুগে নারী সমাজ ছিল অবহেলিত। তাদের মর্যাদা ও অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। জাহিলী যুগে বিভিন্ন সমাজে ও সভ্যতায় নারীর প্রতি কি ধরনের সহিংসতা চলত তা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

প্রাচীন গ্রীক সমাজে নারীদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কোন অধিকার ছিল না। সমাজে তারা এত ঘৃণিত ছিল যে, তাদের শয়তানের চেলা বলে অভিহিত করা হত। উত্তরাধিকার থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। রোমান সমাজে নারীদের আইনগত কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না। নারী ছিল লাঞ্ছনা ও অবজ্ঞার পাত্রী। রোমান আইন দীর্ঘকাল পর্যন্ত নারীদের মর্যাদাকে হেয় ও নীচু করে রেখেছিল।[৪] পরিবারের প্রধান ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রাখত। কোন নারীর স্বামী মারা গেলে তার পুত্র, ভাই, চাচা অথবা অনুরূপ নিকটাত্মীয় ঐ নারীর ওপর অবৈধ কর্তৃত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করত।[৫]

প্রাচীন হিন্দু সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর নারীর বেঁচে থাকার অধিকার ছিল না। এমনকি এক সময়ে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে একই চিতায় জীবন দিতে হতো।[৬]

---

[৩]. হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, আল-কাহেরা : আল-মাকতাবাতুত্-তাওফীকিয়্যাহ্, তা. বি., পৃ. ৬৫, ১২৫ اَلْمُؤْمِنُ يَغْبِطُ وَالْمُنَافِقُ يَحْسُدُ

[৪]. ড. ফাতিমা উমর নাসীফ, *হুকুকুল মারআতি ওয়া ওয়াজিবাতুহা ফী দু'ইল কিতাব ওয়াস্-সুন্নাহ*, আল-কাহেরাঃ মাতবাআতুল ম্যাদানী, ১৯৯২, পৃ. ২১

[৫]. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ উরফা, *হুকুকুল মারআতি ফিল ইসলাম*, আল-কাহেরাঃ আস্-সালাফিয়্যা, তা. বি., পৃ. ২১

[৬]. মাহমূদ মাহদী ইস্তাম্বুলি ও মুস্তফা আবুন্-নাছর আশ্-শালবী, *নিসাউন হাওলার-রাসূল ওয়ার-রাদ আলা মুফতারায়াতিল-মুসতাশরিকীন*, জেদ্দাঃ মাকতাবাত আস্-সাওয়াদী, ১৯৯৫, পৃ. ২২; ড. মুস্তাফা আস্-সিবাঈ, *আল-মারআতু বায়নাল-ফিক্হ ওয়াল-কানূন*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, তা. বি., পৃ. ১৮

ইয়াহুদীরা নারীকে অভিশাপ মনে করত। খ্রিস্ট সমাজের দৃষ্টিতে নারী হলো শয়তানের প্রবেশদ্বার এবং নিজের সৌন্দর্য নিয়ে তার লজ্জিত থাকা উচিত।[৭] মোস্তাক নামক এক যাজক বলেন, "নারী এক অনিবার্য আপদ। এক লোভনীয় আপদ। পরিবার ও সমাজের জন্য হুমকি। মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা"।[৮] ৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল নারীকে কি মানুষ বলে বিবেচনা করা হবে, নাকি অমানুষ বলে? অবশেষে স্থির করা হয়, সে মানুষ বটে, তবে তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষের সেবা করা। পাশ্চাত্যবাসীর এ ঘোষণা অব্যাহত থাকে মধ্যযুগ পর্যন্ত। ১৮০৫ সাল পর্যন্ত বৃটিশ আইনে স্ত্রীকে বিক্রি করার অধিকার ছিল স্বামীর। এ সময় স্ত্রীর মূল্য বেঁধে দেয়া হয় ছয় পেন্স।[৯]

জাহিলী যুগে পূর্বে সমগ্র বিশ্বে নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয় ও মর্মান্তিক। নারীরা এ সময়ে মানুষরূপে পরিগণিত হত না। নারী তার দেহের রক্ত দিয়ে মানব বংশধারা অব্যাহত রাখলেও তার সেই অবদানের কোন স্বীকৃতি ছিল না। সে পিতা, ভ্রাতা, স্বামী সকলের দ্বারাই নিগৃহীত হতো। যুদ্ধবন্দী হলে হাটে-বাজারে দাসীরূপে বিক্রয় হতো চতুষ্পদ পশুর ন্যায়।[১০]

আরব সমাজে কন্যা সন্তানের প্রতি সহিংসতা

আরব সমাজে কন্যা সন্তানের জন্মই যেন ছিল এক অশুভ লক্ষণ ও অবমাননাকর।[১১] তাই কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণের সাথে সাথে লজ্জায়, অপমানে ও দুঃখে তার জন্মদাতার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যেত। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে পিতা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তাকে জীবন্ত মাটিচাপা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করত না।[১২] তারা কন্যা সন্তানের প্রতি সহিংস আচরণ করতো। তাদের অবস্থা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

---

৭. সালাহুদ্দীন মাকবুল আহমাদ, *আল-মারআতু বাইনা হিদায়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াইতিল ইলাম*, কুয়েত: দারু ইলাফিত্-দাওলিয়্যাহ লিন্-নাশরি ওয়াত্-তাওযী', ১৪১৮, পৃ. ৩৭

৮. মাহমুদ মাহদী ও অন্যান্য, *নিসাউন হাওলার-রাসূল ওয়ার-রাদ 'আলা মুফতারায়াতিল-মুসতাশরিকীন*, পৃ. ৪৪; ড. মুস্তাফা আস-সিবায়ী, *আল-মার'আতু বাইনা হিদায়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াইতিল ই'লাম*, পৃ. ৪১

৯. ড. মুস্তাফা আস্-সিবায়ী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯-১৪

১০. সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাত বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৩, খ. ৪, পৃ. ৭২; আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৫, পৃ. ১৬

১১. সালাহুদ্দীন মাকবুল আহমাদ বলেন,

كَانَتْ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ عُرْضَةً لأَنْوَاعٍ مِنَ الإِضْطِهَادِ وَالظُّلْمِ وَالإِهَانَةِ.

"জাহেলী যুগে নারীরা বিভিন্ন প্রকার যুলম, নির্যাতন, নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার স্বীকার হতো"। দ্র. *আল-মারআতু বাইনা হিদায়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াইতিল ইলাম*, কুয়েত: দারু ইলাফিত্-দাওলিয়্যাহ লিন্-নাশরি ওয়াত্-তাওযী', ১৪১৮, পৃ. ৪৭

১২. *সীরাত বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭২; আব্দুল খালেক, *সাইয়্যেদুল মুরসালীন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০, খ. ১, পৃ. ১৭; ড. ফাতেমা ওমর নাসীফ বলেন,

"তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয় এর গ্লানিহেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যে সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না নিকৃষ্ট"।[১৩]

জাহিলী সমাজের লোকেরা মনে করত, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ নেই। একটি কন্যা সন্তান লালন-পালনের জন্য যে অর্থ ও শ্রম ব্যয় হয় তা দিয়ে অনায়াসে একটি পুত্র সন্তান লালন-পালন করা যায়। অথচ যুদ্ধ ক্ষেত্রে একটি পুত্র সন্তান যতটুকু প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান, একটি কন্যা সন্তান ততটুকু মূল্যহীন। সে যদি কোনভাবে শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে যায় তাহলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি। এ সকল সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য তারা জঘন্য পথ বেছে নিল। আর তা হল কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠের সাথে সাথেই তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা।[১৪]

আরবদের মধ্যে সর্ব প্রথম রাবীআ গোত্রে কন্যা সন্তান জীবন্ত দাফন করার প্রথা শুরু হয়। এর কারণ ছিল তাদের সমাজপতির এক কন্যাকে অপহরণকারীরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। এরপর তাদের সাথে সন্ধি করে কন্যাকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে অপহরণকারীরা তাকে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়। কিন্তু কন্যাটি পিতার গোত্রে না

فهم ينسبون لله سبحانه وتعالى إتخاذ البنات في حين أنهم يرغبون عن هن فحين يبشر أحدهم بولادة بنت يسود وجهه خجلا ويضيق صدره غيظا ويتحاش رؤية الناس ويحار ماذا يفعل هل يتخلص منها؟ أم يحتفظ بها على ما في ذالك من الغضاضة والهوان.

"কন্যা সন্তানদের ব্যাপারে তারা নিরুৎসাহী হওয়া সত্ত্বেও মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে তারা বলে, আল্লাহ্ তাআলা কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ তাদেরকে যখন কন্যা সন্তান জন্মের সংবাদ প্রদান করা হত তখন তাদের মুখমণ্ডল লজ্জায় বিবর্ণ হয়ে যেত। তাদের বক্ষ ক্রোধে সংকীর্ণ হয়ে যেত। লোকচক্ষুর আড়ালে থাকত। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যেত। তারা চিন্তা করত এ অপমান থেকে মুক্তি পাবে কিনা? নাকি এ লাঞ্ছনা সহ্য করেই জীবন যাপন করবে"।

দ্র. *হুকুকুল মারআতি ওয়া ওয়াজিবাতুহা ফী দুইল কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ*, আল-কাহেরাঃ মাতবাআতুল মাদানী, প্রথম সংস্করণ, ১৪১২, পৃ. ৫০

[১৩]. আল-কুরআন, ১৬: ৫৮-৫৯

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم- يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون

[১৪]. আহমদ খাকী, *আল-মারআতু ফি মুখতালাফিল উসূল*, মিসরঃ দারুল-কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৪৭, পৃ. ৬৩; ড. আব্দুল মালিক, *আদর্শ নারী ও মহিলাদের ওয়াজ*, অনুবাদঃ মাওলানা বশির মেসবাহ, ঢাকাঃ ইসলাম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮, পৃ. ১৪; Syed Rashid Khalid, *Muslim Law*, New Delhi: Eastern Book Company, 2nd Edition, 1979, P. 5.

ফিরে অপহরণকারীদের কাছেই থেকে যায়। ফলে রবীআ গোত্র রাগান্বিত হয়ে তাদের মাঝে কন্যা সন্তান দাফন করার প্রথা চালু করে।[১৫]

এরপর বনূ আসাদ ও বনূ তামীম গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এ জঘন্য পথ অনুসরণ করে। পরবর্তীতে অন্যান্য গোত্রের মাঝে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ধনী, গরীব, আমীর-ফকীর সকলেই তাদের মিথ্যা অহংকার ও আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে এ পথ অনুসরণ করত। তাদের এ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল"।[১৬]

তারা মনে করত, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ সাধারণ আরবদের জন্য সমস্যা বয়ে নিয়ে আসে। তাই তারা কোন গর্ভধারিণীর প্রসবকাল নিকটবর্তী হলে একটি গর্ত খুঁড়ে তার পাশে বিছানা পেতে তাকে রাখা হত। কন্যা সন্তান জন্ম হলে তাকে সাথে সাথে কাপড় জড়িয়ে সেই গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেয়া হতো।[১৭] অনেক সময় বিবাহ সভায় এরূপ শর্ত লিখিত হতো যে, উক্ত দম্পতির কন্যা সন্তান জন্মিলে তাকে মেরে ফেলতে হবে। সেক্ষেত্রে ঐ নিষ্ঠুর কাজ মাকে পরিবারের আমন্ত্রিত মহিলাদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করতে হতো।[১৮]

কন্যা সন্তানের বয়স যখন ছয় বছর পূর্ণ হতো, তখন স্বামী তার স্ত্রীকে বলত, কন্যা সন্তানটিকে সুগন্ধি মেখে অলংকার পরিয়ে দাও। এরপর পিতা কন্যা সন্তানকে স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনের নিকট দেখাতে নিয়ে যেত। তারপর কন্যাটিকে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে সেখানে একটি গর্ত খোড়া হতো। পিতা কন্যাটিকে গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে গর্তের দিকে তাকাতে বলত। কন্যাটি গর্তের দিকে তাকাতেই পিতা পেছন দিক থেকে ধাক্কা মেরে গর্তে ফেলে দিত। গর্তে পড়ে অসহায় শিশুটি আর্ত চিৎকার করতে থাকত। পাষণ্ড পিতা তখন গর্তটি মাটি দিয়ে ভরাট করে সমান করে দিত।[১৯] এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসে একটি মর্মান্তিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যার বিবরণ শ্রবণ করে রসূলুল্লাহ্ স.-এর দু'চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হয়েছে। হাদীসটি এই,[২০] "এক ব্যক্তি নবী করীম স.-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা ছিলাম জাহিলী

---

[১৫]. মাহমূদ আল-আলূসী আল-বাগদাদী, *রূহুল মাআনী*, বৈরূত: দারু ইহ্ইয়াইত্-তুরাসিল আরাবী, তা. বি., খ. ৩০, পৃ. ৬৭; মাহমূদ মাহদী ইস্তাম্বুলি ও মুস্তফা আবুন-নাছর আশ-শালবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

[১৬]. আল-কুরআন : ৮১: ৮-৯ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

[১৭]. মুহাম্মদ আফতাব উদ্দীন, *সীরাতে খাতামুন্নাবীঈন*, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬, পৃ. ৫৮

[১৮]. এ. এফ. এম. আব্দুল জলীল, *মুসলিম সভ্যতায় নারী*, খুলনা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০, পৃ. ৬

[১৯]. মাহমূদ ইবনে উমর আয-যামাখশারী, *আল-কাশশাফ*, বৈরূত: দারুল-কুতুবিল আরাবী, তা. বি., খ. ৪, পৃ. ৮০৭

[২০]. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্দুর রহমান আদ্-দারিমী, *সুনানুদ্-দারিমী*, অনুচ্ছেদ : মা কানা আলাইহীন্-নাসু কাবলা মুবআসিন্-নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা মিনাল-জাহলি ওয়াদ্-দালালাতি, বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যা, ১৯৯৬, খ. ১, পৃ. ৯

যুগের লোক এবং প্রতিমা পূজারী। আমরা কন্যা সন্তানদিগকে হত্যা করতাম। আমার একটি কন্যা সন্তান ছিল। আমি ছিলাম তার খুব প্রিয়। আমি ডাকলে সে আমার ডাকে খুবই আনন্দিত হয়ে সাড়া দিতো। একদিন আমি তাকে ডাকলে সে আমার নিকট চলে আসে। আমি তাকে নিয়ে অনতিদূরে আমাদের পরিবারের একটি কূপের নিকট আসলাম। আমি তার হাত ধরে তাকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করলাম। তার শেষ বাক্য যা আমার কর্ণগোচর হয়েছে তা হলো, আব্বা, হায় আব্বা। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ স. কাঁদলেন, এমনকি তাঁর দু'চক্ষু হতে অশ্রুর ফোটা পড়তে লাগল। রসূলুল্লাহ্ স.-এর দরবারে উপস্থিত এক ব্যক্তি লোকটিকে বলল, তুমি রসূলুল্লাহ্ স.-কে বেদনাতুর করেছ। রসূলুল্লাহ্ স. তাকে বললেন, 'থাম, যে বিষয় তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে সে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, আমার নিকট তোমার ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি কর। সে পুনরাবৃত্তি করলে তিনি আবারও কাঁদলেন, এমনকি তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রুর ফোটা গড়িয়ে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। অতঃপর তিনি তাকে বলেন, "জাহিলী যুগে তারা যা করেছে, তা আল্লাহ্ ক্ষমা করেছেন। অতএব, তুমি এখন নতুন উদ্যমে কাজ কর"।

কায়স ইব্‌নে আসিম নামে এক ব্যক্তি মুসলমান হয়ে রসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, জাহিলী যুগে আমি নিজ হাতে আমার বার অথবা তেরটি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাফন করেছি।[২১] বর্ণিত আছে যে, কায়সকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল মেয়েদের জীবন্ত প্রোথিতকালে তার হৃদয়ে মায়া-মমতার সঞ্চার হয়েছিল কিঃ তিনি বললেন, হ্যাঁ, একটি মেয়ের জন্য ব্যথিত হয়েছি। কারণ, তাকে যখন মাটি চাপা দিচ্ছিলাম, তার বুক পর্যন্ত নিম্নার্ধ মৃত্তিকা গর্তে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল, এমন সময় মেয়েটি উভয় হস্ত প্রসারিত করে আমার দাড়িগুলো ঝাড়তে লাগলো এবং বলতে লাগল, আহা! আব্বাজান আপনার দাড়িতে ধুলা লেগে গিয়েছে। তখন অন্তরে দয়ার উদ্রেক হলো। পাছে মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে দাফন করতে না পারি এ ভয়ে তাড়াতাড়ি মাটি ফেলে গর্তটি পূর্ণ করে মেয়েটিকে অদৃশ্য করে ফেললাম।[২২]

জাহিলী যুগে আরব সমাজে নারীদের জন্য মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী সূত্রে অংশীদার হওয়ার কোন নিয়ম ছিল না।[২৩] স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নিজ

---

[২১]. ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, বৈরূত: দারুল-ফিক্‌র, তা. বি., খ. ৪, পৃ. ৪

[২২]. মোল্লা মাজদুদ্দীন, *সীরাতে মুস্তফা*, দিল্লী: আল-মাকতাবাতুর-রশীদিয়া, ১৯৫৭, পৃ. ৭৭-৭৮

[২৩]. হাসানী নাসসার, *হুকুকুল মার'আতি ফিত-তাশরীইল-ইসলামী*, দারুল-মাআরিফ বিল সিকান্দারিয়া, তা. বি., পৃ. ২৬; মাহমুদ শুকরী আলূসী, *বুলূগুল আরব*, বাগদাদ: ১৩১৪ হি., খ. ২, পৃ. ৫৬; ড. ইবতিসাম 'আব্দুর রহমান হালওয়ানী, *'আমালুল মার'আ ফিস্-সাউদিয়া ওয়া মুশকিলাতু-'আমা আরিকিলি 'আমা'*, দারুল 'উকায, ১৯৮২, পৃ. ১৯; মুহাম্মদ ইবনে 'আব্দিল্লাহ 'আযযাহ, *হুকুকুল-মার'আতি ফিল ইসলাম*, রিয়াদ: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৮০, পৃ.২৭; Zahirahmed Mohammed, *Glimpse of the Prophets life and time*, New Delhi: Ambika publication, P. 148; Muslim Law, P. 5.

স্বামীর ওয়ারিসদের ওয়ারিসী সম্পত্তিতে পরিণত হতো। তাদের কেউ ইচ্ছা করলে তাকে বিবাহ করত অথবা অপরের নিকট বিবাহ দিত অথবা আদৌ বিবাহ না দেয়ার ব্যাপারেও তাদের ইখতিয়ার ছিল, যাতে স্বামী প্রদত্ত তার সম্পত্তি অপরের হস্তগত হতে না পারে।[২৪] বিবাহ হওয়ার পর পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যার কোন অধিকার থাকত না। পিতা, স্বামী অথবা আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কোন অধিকার ছিল না। বরং মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অন্যতম অঙ্গ হিসাবেই তাদেরকে গণ্য করা হতো। মূলত সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না।[২৫] উমর রা. বলেন, "আল্লাহ্র শপথ! জাহিলী যুগে আমরা নারীদের কোন মর্যাদাই দিতাম না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াত অবতীর্ণ করেন এবং তাদের জন্য উত্তরাধিকারী স্বত্বে একটি অংশ নির্ধারণ করেন"।[২৬]

উহুদ যুদ্ধের পর সাদ ইবনে রুবাই আল-আনসারী রা.-এর স্ত্রী রসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট এসে অভিযোগ করল, আমার স্বামী উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, তার দু'টি কন্যা সন্তান রয়েছে। কিন্তু তার ভ্রাতা সমুদয় ধন সম্পদ দখল করে নিয়েছে। কন্যা দু'টির বিবাহের ব্যবস্থা কি রূপে হবে?[২৭] এরপর ইসলাম উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নারীর অংশ নির্দিষ্ট করে দিলে আরবরা বিস্মিত হলো। তারা রসূলুল্লাহ্ স.-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রসূল! নারী কি অর্ধেকের হকদার? অথচ না জানে সে ঘোড়ার

---

[২৪]. *সীরাত বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭৫

[২৫]. মাওলানা মুহাম্মদ তাহের, *রমণীর মান*, ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ. ১১; আব্দুল খালেক, *বিশ্ব নবীর কর্মসূচী*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮, পৃ. ১৭; আব্দুল হামিদ সিদ্দিকী, *মহানবী হযরত মুহাম্মদ স.-এর জীবনী*, ঢাকা: আলীগড় লাইব্রেরী, ১৯৯৩, পৃ. ৫; ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, ঢাকা: আর. আই. এস. পাবলিকেশন্স, ১৪১৬, পৃ. ১২

[২৬]. সায়্যিদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, অনুবাদ: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ৫

وَاللهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ

[২৭]. আল-জামিউত-তিরমিযীতে এ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, হাদীসটি এই,

قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.

দ্র. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, দিমাশক: মাকতাবাতু ইবন হাজার, ১৪২৪ হি., অধ্যায় : আল-ফারাইয, অনুচ্ছেদ : মা জা'আ ফী মীরাছিল বানাত, পৃ. ৫৮৭; ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, দিমাশক: মাকতাবাতু ইবনে হাজার, ১৪২৪, অধ্যায় : আল-ফারাইয, অনুচ্ছেদ : মা জা'আ ফী মীরাসি সুলব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৩-৫৯৪।

পিঠে আরোহণ করতে, না পারে আত্মরক্ষা করতে।[২৮] স্ত্রী যদি কোনভাবে কিছু সম্পদের মালিক হতো যেমন বাবা-মা ও আত্মীয় স্বজনের বাড়ি থেকে প্রাপ্ত উপঢৌকন, তখন এটা স্ত্রী ভোগ করতে পারত না বরং স্বামীই নিয়ে নিতো।[২৯] তখন এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا "হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়"।

জাহিলী সমাজে ইয়াতীমদের প্রতি তাদের অভিভাবকরা কোন সুবিচার করত না। কোন সুন্দরী রূপসী ও সম্পদশালী ইয়াতীম বালিকা যদি কারো তত্ত্বাবধানে এসে যেতো, তাহলে সে নিজেই তাকে বিবাহ করতো, কিন্তু ঠিকমত মোহর আদায় করত না। তাদের ধন-সম্পদ ও সুখ-সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত করতো।[৩০]

সভ্য যুগে কন্যা হত্যার কাজ বর্বর যুগকেও ছাড়িয়ে গেছে। কেননা তখনো কিছু সংখ্যক নাবালিকা কন্যাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হয়েছিল, অথচ আজ সভ্য যুগে সমাজে হাজার হাজার বৈধ-অবৈধ মানবশিশু জীবন্ত সমাধি হচ্ছে, ফেলে দেয়া হচ্ছে কন্যা সন্তানদেরকে হাসপাতালের পাশে, জঙ্গলের ধারে, ডাস্টবিনে। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে গর্ভের অবস্থা জেনে নিয়ে লাখো কন্যাশিশুকে জন্মের আগেই ভ্রূণহত্যার মাধ্যমে নিঃশেষ করে দেয়া হচ্ছে।

বি. বি. সি. প্রচার মাধ্যম থেকে Let her die নামক এক অনুষ্ঠানে হিন্দুস্তানী নারী ভ্রূণ হত্যার একটা পরিসংখ্যান দিয়েছে। এমিলি ব্যাকহান (EmilyBechan) নামক এক বৃটিশ সংবাদদাতা বৃটেন থেকে হিন্দুস্তানে এসেছিলেন। এই পরিসংখ্যান তৈরী করতে হিন্দুস্তানের স্টার টিভিতে নারী ভ্রূণ হত্যার একটি পরিসংখ্যান দিয়েছিলেন যে, হিন্দুস্তানে স্ত্রীভ্রূণ সনাক্ত করার পর প্রতিদিন তিন হাজারেরও বেশি স্ত্রী ভ্রূণের গর্ভপাত করানো হয় অর্থাৎ প্রতি বছর প্রায় ১১ লক্ষ স্ত্রী ভ্রূণ হত্যা করা হচ্ছে।[৩১]

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ইসলাম

মানব ইতিহাসের তমসাচ্ছন্ন সময়ে মানবতা যখন অন্ধকারের বন্দি খাঁচায় হাতড়ে ফিরছিল ঠিক তখনই বিশ্বশান্তি ও মুক্তির সর্বজনীন জীবন বিধান ইসলাম নারীর অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। বর্ণ, ভাষা, ভৌগোলিক সীমারেখা, সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব, আরব-অনারব ইত্যাদির বাহ্যিক, আত্মিক প্রতিবন্ধকতা বিদূরিত করে সাম্য-মৈত্রী ও সুমহান শান্তির ঘোষণা দেয় ইসলাম। নারীকে হীনতার নিম্নতম স্থান থেকে উর্ধ্বে তুলে এনে তাদেরকে যথাযথ অধিকার প্রদান করে। ইসলামী সভ্যতায় সর্বপ্রথম নারীকে মা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে, কন্যা হিসাবে এবং বোন হিসাবে মহান মর্যাদায় ভূষিত করা হয়।

---

[২৮]. ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫৮

[২৯]. ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[৩০]. আহমদ মনসুর, *বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ স.*, ঢাকা: তাসনিম পাবলিকেশন, ১৯৯৫ , পৃ. ৭৮

[৩১]. ড. হালীমা, কন্যা হিসেবে নারীর অধিকার, রাহমানী পয়গাম, ঢাকা : অ. বি. ১৯৯৯, পৃ. ২৩

মা হিসাবে নারীর মর্যাদা

ইসলাম মা হিসাবে নারীকে যে সুমহান মর্যাদা দিয়েছে পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থার সাথে তার তুলনা হতে পারে না। মাকে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে।[৩২] আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন, "আর তোমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে"।[৩৩]

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ করেছি। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে বড় কষ্টের সাথে এবং তাকে প্রসব করেছে অতি কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও স্তন্য ছাড়াতে ত্রিশ মাস লেগেছে"।[৩৪]

সদ্ব্যবহার পাবার ক্ষেত্রে পিতার চেয়ে মাতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ স. থেকে এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যে আমার সদ্ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, 'তোমার মা'। সে বলল, 'এরপর কে?' তিনি বললেন, 'এরপরও তোমার মা'। সে বলল, 'এরপর কে?' তিনি বললেন, 'এরপরও তোমার মা'। সে বলল, 'এরপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার পিতা"।[৩৫]

মা যদিও বিধর্মী হয় তবুও তার সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য রসূলুল্লাহ্ স. নির্দেশ প্রদান করেছেন। আসমা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ স.-কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার আম্মা আমার নিকট এসেছেন। তিনি দীন ইসলাম গ্রহণে বিমুখ বা অনাগ্রহী, আমি তার সাথে সদাচরণ করব কি? রসূলুল্লাহ্ স. বললেন, হ্যাঁ"।[৩৬]

---

[৩২]. সালাহুদ্দীন মকবূল আহমদ, *আল-মার'আতু বায়না-হিদায়াতিল-ইসলাম ওয়া গাওয়ায়াতুল-ই'লাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪

[৩৩]. আল-কুরআন, ১৭: ২৩ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

[৩৪]. আল-কুরআন, ৪৬: ১৫

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

[৩৫]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস্-সিলাতিল-আদাব, অনুচ্ছেদ : বিররুল ওয়ালিদায়নি ওয়া ইন্নাহুমা আহাক্কু বিহিমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০৯; ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বিররি ওয়াস্-সিলাহ্, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফি বিররিল-ওয়ালিদায়নি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪২

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ».

[৩৬]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফাযলিন্-নাফকাতি ওয়াস্-সাদাকাতি আলা-আকরাবীনা ওয়ায্-যাওজি ওয়াল-আওলাদি ওয়াল-ওয়ালিদায়নি ওয়া লাও-কানূ মুশরিকীনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪

রসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেন, "বেহেশত মায়েদের পায়ের তলে অবস্থিত"।[৩৭] অর্থাৎ মাকে যথাযোগ্য সম্মান দিলে, তার উপযুক্ত খেদমত করলে এবং তার হক আদায় করলে সন্তান বেহেশত লাভ করবে। অন্য কথায় সন্তানের বেহেশত লাভ মায়ের খেদমতের উপর নির্ভরশীল।

স্ত্রী হিসাবে নারীর মর্যাদা

ইসলাম স্ত্রী লোককে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। স্ত্রীকে সুখ-শান্তি, সীমাহীন আনন্দ, ভালবাসা, পুষ্পের সৌন্দর্য, মনোহর-স্নিগ্ধ ইত্যাদি সুন্দর গুণাবলীতে আখ্যায়িত করেছে।[৩৮] স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সমান এ কারণেই স্বামী-স্ত্রী উভয়ের এটা অবশ্য কর্তব্য যে, তারা সৌহার্দপূর্ণ জীবন যাপন করবে এবং কোন প্রকার মানসিক অসন্তুষ্টি ও দ্বিধা ব্যতিরেকেই তাদের যা কিছু আছে একে অন্যের জন্য অকাতরে ব্যয় করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "স্ত্রীদেরও তেমনি অধিকার রয়েছে যেমন স্বামীদের রয়েছে তাদের উপর এবং তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে"।[৩৯] আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন, "এবং তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তমরূপে জীবন যাপন কর"।[৪০] রসূলুল্লাহ্ স.বলেন, "যে তোমাদের স্ত্রীর নিকট ভাল সেই প্রকৃত ভাল। আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের জন্য উত্তম"।[৪১]

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার এই যে, স্বামী তার খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র সঠিকভাবে সরবরাহ্ করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ، وَهِيَ رَاغِبَةٌ - أَوْ رَاهِبَةٌ - أَفَأَصِلُهَا قَالَ: ((نَعَمْ))

[৩৭]. ওয়ালিয়ুদ্দীন মুহাম্মাদ, *আল-মিশকাতুল মাসাবীহ,* দিল্লী : কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ্, তা. বি., পৃ. ৪২১ الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

[৩৮]. আল-কুরআন, ৩ : ১৪

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ.

সালাহুদ্দীন মাকবূল স্ত্রী হিসাবে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, زُيِّنَ لِلنَّاسِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِنْ أَنْوَاعِ الْمَلَاذِ الَّتِي يَشْتَهُونَهَا فَبَدَأَ هَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِنِسَاءِ

"দুনিয়ার মধ্যে কতিপয় উপভোগ্য ও কাম সামগ্রী যা মানুষের জন্য শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে আল্লাহ্ তাআলা তন্মধ্যে স্ত্রীকে সূচনা হিসাবে উল্লেখ করেছেন।" দ্র. *আল-মার'আতু বায়নাল-হিদায়াতিল-ইসলাম ওয়া গাওয়ায়াতুল-ই'লাম,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫;

[৩৯]. আল-কুরআন, ২: ২২৮ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

[৪০]. আল-কুরআন, ৪: ১৯ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

[৪১]. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-মানাকিব, অনুচ্ছেদ : ফাযলু আযওয়াজিন-নাবিয়্যি স., পৃ. ১০৭৮ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

বলেন, "স্ত্রীলোকদের খোর-পোষ এবং পরিধেয় বস্ত্র উত্তমভাবে সরবরাহ করা তাদের উপর অবশ্য কর্তব্য"।[৪২] রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "তোমাদের উপর কর্তব্য হচ্ছে তাদের খাদ্য-সামগ্রী এবং বস্ত্রাদি সঠিকভাবে প্রদান করা"।[৪৩]

কন্যা হিসাবে নারীর মর্যাদা

সৃষ্টিগতভাবে কন্যা সন্তান পিতার নিকট পুত্র সন্তানদের চেয়েও অধিক স্নেহের পাত্র হয়ে থাকে। সম্ভবত এর কারণ হল কন্যারা বিবাহের পর পিতা থেকে দূরে চলে যায়। কন্যা সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত এবং হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা ইসলামে তার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে। জাহিলী যুগে আরব সমাজে কন্যা ছিল নির্যাতিতা, নিপীড়িতা এবং ঘৃণার ও ক্রোধের পাত্র।[৪৪] ইসলাম এ কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং কন্যা সন্তানকে পুরুষ সন্তানের মতই অধিকার দিয়েছে। সন্তান দান করার একমাত্র মালিক আল্লাহ্। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আসমান ও জমীনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা যাদেরকে ইচ্ছা যুগ্মভাবে পুত্র ও কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা করে দেন"।[৪৫]

কন্যা সন্তান হত্যার প্রথারোধে রসূলুল্লাহ্ স. ঘোষণা করেন,[৪৬] "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও জীবন্ত কন্যা সন্তান হত্যাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন"।

কন্যা সন্তান প্রতিপালন করলে তার প্রতিদান কি হবে সে সম্পর্কে হাদীসে রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তানকে বালেগা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে, কিয়ামত দিবসে সে ও আমি এমন অবস্থায় আসব, এই বলে তিনি তাঁর হাতের আংগুলগুলো একত্র করলেন"।[৪৭]

---

৪২. আল-কুরআন, ২: ২৩৩ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

৪৩. প্রাগুক্ত, وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

৪৪. সালাহুদ্দীন মকবুল আহমদ, *আল-মার'আতু বায়নাল-হিদায়াতিল-ইসলাম ওয়া গাওয়ায়াতুল-ই'লাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯

৪৫. আল-কুরআন, ৪২: ৪৯-৫০

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُورَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ

৪৬. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-হাজ্জ, অনুচ্ছেদ : হিজ্জাতুন নাবিয়্যি স., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫; *মুসতাদরাক হাকিম*, খ. ৪, পৃ. ১৭৭

৪৭. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস্-সিলাত ওয়াল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফাযলুল ইহসানি ইলাল-বানাতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩৭

عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

ইসলাম পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর কোন প্রাধান্য দেয় না বরং পুত্র সন্তানের মত কন্যা সন্তানকে যত্নের সাথে প্রতিপালন করতে বলা হয়েছে। ইসলাম নারী সমাজ উন্নয়নে কন্যা সন্তানের জন্মকে লজ্জা, অপমান ও লাঞ্ছনা হতে মুক্ত করে তাদেরকে যথাযথ মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। কন্যা সন্তানকে সঠিকভাবে প্রতিপালন করলে আল্লাহ্ তাকে জান্নাত প্রদান করবেন বলে রসূলুল্লাহ্ স. ঘোষণা করেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম কন্যা সন্তানকে কত মর্যাদা দান করেছে।

সন্তানদের মাঝে উপঢৌকন প্রদানে ন্যায়বিচার করা

নুমান ইবনে বাশীর রা. থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা তাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমি আমার এ ছেলেকে উপঢৌকন স্বরূপ কিছু দান করেছি। রসূলুল্লাহ্ স. বললেন, 'তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে অনুরূপ দান করেছ?' তিনি বললেন, 'না'। তখন রসূলুল্লাহ্ স. বললেন, 'তাহলে তা ফিরিয়ে নাও'।[৪৮]

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ইসলাম

ইসলাম নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামই বিশ্বের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন যেখানে নারী ও পুরুষকে পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক বলে অভিহিত করে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ন্যায্য অধিকারের পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করেছে এবং বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে তার কার্যকারিতাও প্রমাণ করেছে। এরপর নারী জাতিকে ব্যক্তিসত্তার অধিকার প্রদান করেছে।[৪৯] ইসলাম নারীকে সাম্যের, শিক্ষার, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে। মুসলিম পারিবারিক আইনে একজন নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর অবধারিত কয়েকটি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেগুলো হচ্ছে, ভরণ-পোষণ প্রাপ্তি, মাহর গ্রহণ, উত্তরাধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তম ব্যবহার প্রাপ্তি, জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অংশ নেয়া প্রভৃতি।

১. সাম্যের অধিকার

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও বস্তুবাদী সভ্যতা নারীজাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করে পাপ ও অপবিত্রতার যে কলঙ্ক লেপন করেছে, ইসলাম সে সম্পর্কে ঘোষণা করে যে, নারী পুরুষ একই উৎস হতে উদ্ভূত। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "হে মানব! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক

---

[৪৮]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-হিবা, অনুচ্ছেদ ; আল-হিবাতু লিল ওয়ালাদি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ২০৪

[৪৯]. মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল-মুকাদ্দাম বলেন, مزّق الإسلام حجب الفوارق بين النساء كما مزقها بين الرجال، فتطامنت الرؤوس، وتساوت النفوس. "ইসলাম নারীদের মাঝে পারস্পরিক বিভেদের প্রাচীর চূর্ণ করে দিয়েছে যেমন পুরুষদের মাঝে বিভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়েছে। ফলে সকলেই ইসলামের প্রতি অনুগত হয়েছে এবং সকল ব্যক্তির নিজস্ব মর্যাদা সমান হয়েছে"।
দ্র. *আল-মার'আতু বায়না তাকরীমিল ইসলাম ওয়া ইহানাতিল জাহিলিয়্যাহ্*, আল-কাহেরা: দারু ইবনিল জাওযী, ১৪২৬, পৃ. ২১৪

পুরুষ এবং এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী"।[৫০]

নারী পুরুষ একে অপরের সম্পূরক। যে যতটুকু ভাল কাজ করবে, সে ততটুকুই প্রতিদান পাবে। এ ব্যাপারে কোন বৈষম্যের অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, "আমি তোমাদের কোন ভাল কর্মই বিফল করি না। তা পুরুষের কিংবা মহিলার যারই হোক না কেন। তোমরা পরস্পর সমান"।[৫১]

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতায় নারী কোন কিছু উপার্জন করলে সে তার অধিকারী হতে পারত না, স্বামী কিংবা আত্মীয়ের অধিকারে চলে যেত। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন, "পুরুষ যা উপার্জন করে, তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা উপার্জন করে, তা তার প্রাপ্য অংশ"।[৫২] উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ন্যায্যতা ও অধিকারের দিক দিয়ে পুরুষকে একচ্ছত্রভাবে অধিকার দেয়া হয়নি; বরং নারী পুরুষ উভয়কে ন্যায্য অধিকার দেয়া হয়েছে।

২. বেঁচে থাকার অধিকার

পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে পিতা-মাতা ও পরিবার খুশী হয়। আর কন্যা সন্তান জন্ম নিলে কেউ কেউ অসন্তুষ্ট হয়। জাহিলী যুগে কোন কোন গোত্র কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাফন করতো। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "ওদের কাউকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয় তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে দেবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট!"[৫৩] নারীর প্রতি এ অমানবিক আচরণ ইসলাম নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

৩. শিক্ষার অধিকার

শিক্ষার মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত। শিক্ষা মানুষকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা উন্নত করবেন"।[৫৪] "কুরআন মাজীদের প্রথম

---

[৫০]. আল-কুরআন, ৪৯: ১৩

يَٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

[৫১]. আল-কুরআন, ৩: ১৯৫ أَنِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ

[৫২]. আল-কুরআন, ৪: ৩২ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ

[৫৩]. আল-কুরআন, ১৬: ৫৮-৫৯

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ.

[৫৪]. আল-কুরআন, ৫৮ : ১১ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ

অবতীর্ণ বাণী হলো, 'পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে"।[৫৫] রসূলুল্লাহ্ স. জ্ঞান অর্জনকে ফরয ঘোষণা করে বলেন, "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয"।[৫৬] সায়্যিদ মুহাম্মদ রশীদ রিযা বলেন,

"সকল আলিম ঐকমত্য পোষণ করে বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর যেসব বিষয় ফরয করেছেন এবং যেসব বিষয় তাদের অবহিত করেছেন সে সব বিষয়ে নারী-পুরুষ সমান"।[৫৭] এমনকি দাসীর ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "যার একটি দাসী রয়েছে, যাকে সে শিক্ষা দান করল এবং উত্তম শিক্ষা দিল, তাকে সে শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দিল এবং উত্তমভাবে শিষ্টাচারিতার শিক্ষা দিল, এরপর তাকে মুক্ত করে দিয়ে বিবাহ করল, তবে তাকে দ্বিগুণ বিনিময় প্রদান করা হবে"।[৫৮]

রসূলুল্লাহ্ স-এর যুগে নারীরা তাঁর বাণী শোনার জন্য তাঁর কাছে যাতায়াত করতেনা। তিনি তাদের জন্য পৃথক মজলিসের ব্যবস্থা করতেন। একজন মুসলিম নারী হিসাবে তার উপর যে সকল ইবাদত ফরয সেগুলো সঠিকভাবে পালনের উদ্দেশ্যে যে সব বিষয় প্রয়োজন সেগুলো শিক্ষা করা তার জন্য ফরয। সে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে, যার দ্বারা সে সমাজে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। নারী চিকিৎসা বিজ্ঞানে পারদর্শী হলে, নারী রোগে অভিজ্ঞ হলে নারী সমাজ তার দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

৪. স্বামী গ্রহণে নারীর অধিকার

ইসলাম নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার এখতিয়ার প্রদান করেছে। এমনকি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর তার অনুমতি ব্যতীত তার বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "বয়ঃপ্রাপ্ত নারীর অনুমতি ব্যতীত তাকে বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কুমারী নারীর বিবাহের সময় তার অনুমতি নিতে হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! তার অনুমতির পদ্ধতি কি হবে? তিনি বললেন, "অনুমতি চাওয়া হলে সে যদি নিশ্চুপ থাকে তবে এটাই তার অনুমতি হিসাবে গণ্য হবে"।[৫৯]

---

[৫৫]. আল-কুরআন, ৯৬: ১ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

[৫৬]. ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আস-সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল উলামা ওয়াল-হিসসু আলা তালাবিল ইলম, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ২৪৯১ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

[৫৭]. মুহাম্মদ রশীদ রিযা, *হুকূকুন্-নিসা',* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ كُلَّ مَا فَرَضَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ وَكُلَّ مَا نَبَّهَهُمْ إِلَيْهِ فَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ سَوَاءٌ.

[৫৮]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : ইত্তিখাযুস্-সারারিয়্যি ওয়ামান আতাকা জারিয়াতান ছুম্মা তাযাওওয়াজাহা, রিয়াদ: দারুস্-সালাম ২০০০, পৃ. ৪৪০
أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ

[৫৯]. ইমাম-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : লা ইউনকিহুল আবু ওয়া গায়রুহুল-বিকরা ওয়াস্-সাইয়্যিবা ইল্লা বিরিদাহুমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

অনুমতি ছাড়া নারীকে বিবাহ দেয়া হলে সে বিবাহের কথা অবগত হওয়ার পর তার ঐ বিবাহ বাতিল করার অধিকার রাখে। বিশিষ্ট ফিকহবিদ সাইয়েদ সাবিক বলেন, "বিবাহের পূর্বে নারীর সম্মতি গ্রহণের মাধ্যমে (বিবাহের কার্য) শুরু করা অভিভাবকের জন্য ওয়াজিব। অভিভাবক আকদের পূর্বে তার সম্মতি জেনে নিবেন, যেহেতু বিবাহ হলে পুরুষ এবং নারীর মধ্যকার স্থায়ী যৌথ ব্যবস্থাপনা এবং নারীর সম্মতি ব্যতিরেকে প্রেম-ভালবাসা স্থায়িত্ব লাভ করে না। এ কারণে শরীয়ত নারীকে জোরপূর্বক বিবাহ দেয়া এবং যেখানে তার আগ্রহ নেই এমন স্থানে পাত্রস্থ করাকে নিষেধ করেছে এবং তার সম্মতির পূর্বে বিবাহকে অশুদ্ধ আখ্যায়িত করেছে"।[৬০]

৫. প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার অধিকার

যে সব কাজ শরীয়ত সম্মত এবং নারী তা যদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে নারীর স্বভাব প্রকৃতির পরিপন্থী নয় এমন কাজ কর্মের ব্যাপারে ইসলাম নারীকে অনুমতি দিয়েছে। তবে যেন সে সব কর্ম করতে গিয়ে নারীর সৎচরিত্রের কোন ত্রুটি না হয় এবং নারীর মর্যাদা হানিকর না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। এসব ক্ষেত্রে ইসলাম নারীর প্রতি কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি বরং তাতে উৎসাহিত করেছে। এমনকি নারীর ইদ্দতের সময়ও তা করতে পারে। যেমন জাবির ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রা. বলেন, "আমার খালাকে তাঁর স্বামী তালাক দিয়ে দিল। কিন্তু এ সময়ের মধ্যেই তিনি নিজের বাগানের কয়েক কাঁদি খেজুর কাটার ইচ্ছা করলেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে কঠোরভাবে নিষেধ করলো। বিষয়টি জিজ্ঞেস করার জন্য তিনি নবী করীম স.-এর দরবারে গেলেন। তিনি তাকে বললেন, বাগানে যাও, তোমার খেজুর কাটো, তুমি সম্ভবত সে অর্থ দান-খায়রাত করতে বা কল্যাণকর কোন কাজে লাগাতে পার"।[৬১]

৬. ভরণ-পোষণ প্রাপ্তি

বিবাহিত নারীর মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। ভরণ-পোষণ বলতে খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, চিকিৎসা ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র সঠিকভাবে সরবরাহ করাকে বুঝানো হয়েছে।[৬২] ইসলাম নারীর ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করেছে। এর দায়িত্ব অর্পণ করেছে পুরুষের

---

৬০. সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস-সুন্নাহ,* আল-কাহেরা : শিরকাতু মানার আদ্-দুওয়ালিয়্যাহ, ১৪১৬ হি., ১৯৯৫ খ্রি., খ. ২, পৃ. ২৬৭।

৬১. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلًا لَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ، لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا.

দ্র. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় আত-তালাক, অনুচ্ছেদ : ফিল মাবতুতাতি তাখরুজু বিন্ নাহার, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১৩৯৩

৬২. ড. ফাতিমা উমর নাসীফ বলেন, 'ভরণ-পোষণ বলতে বুঝায় নারীর প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, কন্যা সন্তান জন্মের পর থেকে পিতার ওপর, বিবাহের পর স্বামীর এবং স্বামী হারা হলে পুত্র সন্তানদের উপর আর পুত্র না থাকলে নারীর পরিবারের নিকটাত্মীয়দের উপর ওয়াজিব। পুরুষের উপর এই ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কুরআন-সুন্নাহ্ দ্বারা ওয়াজিব ও প্রমাণিত।' দ্র. *হুকূকুল মার'আহ্,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

উপর। স্ত্রীকে অর্থনৈতিক কষ্ট থেকে মুক্ত করেছে। সেই সাথে নারীর নাগরিক অর্থনৈতিক অধিকার পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করেছে। বিবাহিত নারী তার ব্যক্তিগত সম্পদ নিজে সংরক্ষণ করবে আর স্বামী তার ভরণ-পোষণ বহণ করবে, যদিও স্ত্রী সম্পদশালী হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,[৬৩] "বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত রিযিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে।"

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,[৬৪] "স্ত্রীলোকের খোর-পোষ এবং পরিধেয় বস্ত্র উত্তম ভাবে সরবরাহ করা তাদের উপর অবশ্য কর্তব্য।"

রসূলুল্লাহ্ স.বলেন,[৬৫] "তোমাদের উপর কর্তব্য হচ্ছে তাদের খাদ্য-সামগ্রী এবং বস্ত্রাদি সঠিক ভাবে প্রদান করা"।

এমনকি তালাকের পর ইদ্দত পর্যন্ত স্ত্রীর ভরণ-পোষণ প্রদান করতে হবে। দাহ্হাক বলেন, "স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিলে স্ত্রী সন্তানকে দুধ পান করালে পিতাকে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর খোরাক পোশাক দিতে হবে"।[৬৬]

৭. মোহর প্রাপ্তির অধিকার

মোহর নারীর অর্থনৈতিক অধিকার। পুরুষ যখন একজন নারীকে বিবাহ করতে চাইবে তখন নারীকে মোহর প্রদান করতে হবে। মোহরের অধিকার জাহিলী যুগে বিভিন্নভাবে লুণ্ঠিত হতো। নারীকে বিবাহ দিয়ে তার পরিবর্তে মোহর নারীর পিতা বা অভিভাবক গ্রহণ করতো, যেমন কোন দ্রব্য বিক্রয় করলে বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করা হয়। নিকাহে শিগারের মাধ্যমে নারীর মাহরের অধিকার ভূলুণ্ঠিত করা হতো। ইসলাম এসব প্রথাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে।

বিবাহ বন্ধন স্থাপনের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক প্রবর্তিত স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকারকে মোহর বলে। বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর দেয়া অবশ্য কর্তব্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,[৬৭] "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে যে স্বাদ গ্রহণ কর, তার বিনিময়ে তাদের মোহর ফরয মনে করেই আদায় করো।" আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,[৬৮] "এবং তাদেরকে বিবাহ করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাদেরকে তাদের মোহর ন্যায় সংগত ভাবে আদায় করবে।"

---

৬৩. আল-কুরআন, ৬৫: ৭ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ

৬৪. আল-কুরআন, ২: ২৩৩ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

৬৫. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-মানাসিক, অনুচ্ছেদ : সিফাতু হাজ্জাতিন নাবিয়্যি স. রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১৩৬৩ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

৬৬. ইমাম ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল-কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩

৬৭. আল-কুরআন, ৪: ২৪ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

৬৮. আল-কুরআন, ৪: ২৫ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

বিবাহের পর স্ত্রীকে কিছু না দিয়ে তার কাছে যেতে রসূলুল্লাহ স. স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। আলী রা. ফাতিমা রা. কে বিবাহ করার পর তাঁর নিকট যেতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ স. তাঁকে বলেন,[৬৯] "তুমি তাকে কিছু প্রদান কর। তিনি বলেন, আমার নিকট কিছুই নেই। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার হুতামিয়্যাহ লৌহ বর্মটি কোথায়? (তা প্রদান কর)।"

৮. পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অধিকার

জাহিলী যুগে নারীদের এবং শিশুদের উত্তরাধিকার সূত্রে কোন অংশ দেয়া হতো না। ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকারের অধিকার দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান; কিন্তু কেবল কন্যা দুই-এর অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ আর এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ। তার সন্তান থাকলে তার পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ; সে নিঃসন্তান হলে এবং পিতামাতা উভয় উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ, তার ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য এক ষষ্ঠাংশ"।[৭০]

৯. রাজনৈতিক অধিকার

ইসলাম নারীকে অন্যান্য বিষয়ের মত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। নারীরা তার লব্ধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে কখনও যদি শাসক গোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে কোন ত্রুটি বা অসঙ্গতি দেখতে পায় তবে এ ব্যাপারে সঠিক পরামর্শ দেয়ার অধিকার রাখে। ইসলাম নারীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মত প্রদান, ভোটদান, সমালোচনা ইত্যাদির অধিকার প্রদান করেছে। ইসলামে রাজনীতির মৌলিক একটি দিক হল, সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ। এ বিষয়ে পুরুষ যেমন ভূমিকা রাখতে পারে, তেমনি নারীও পারে অবদান রাখতে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,[৭১] "মুমিন নর ও মুমিন নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অন্যায় ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে।"

---

[৬৯]. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : ফির রাজুলি ইয়াদখুলু বি ইমরাআতিহি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭৯ أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية

[৭০]. আল-কুরআন, ৪: ১১ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس.

[৭১]. আল-কুরআন, ৯: ৭১ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

ইসলাম নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধক

নারীর প্রতি সহিংস আচরণের কোন সুযোগ নেই বরং ইসলামে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করে বিভিন্নভাবে অধিকার প্রদান করেছে। এবং বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে তার উপকারিতাও প্রমাণ করেছে।[৭২]

আজকের মানব সভ্যতা নারী-পুরুষের মাঝে ভেদাভেদের যে প্রাচীর নির্মাণ করেছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রে নারীদেরকে তুচ্ছ করে দেখা হচ্ছে। আজকের পত্র-পত্রিকা খুললেই দেখা যায়, যৌতুক না দিতে পারায় গলা টিপে স্ত্রী হত্যা, এসিড নিক্ষেপ করে স্ত্রীর শরীর ঝলসে দেয়া, যৌতুকের টাকা সংগ্রহ করতে না পারায় মেয়ে বা মেয়ের পিতা আত্মহত্যা ইত্যাদি। বিভিন্ন তথ্য ও সংবাদমাধ্যম থেকে এ প্রসঙ্গে আমরা করুণ চিত্র পেয়ে থাকি। অথচ ইসলাম নারীদের প্রতি এধরনের সহিংস আচরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বরং তাদের মোহর সানন্দে প্রদান, খোরপোষ, বাসস্থানের ব্যবস্থা করার তাকিদ দিয়েছে। নবী করীম স. বিদায় হজ্জের ভাষণে নারীদের প্রতি সদাচরণ করার জন্য তাকিদ দিয়ে বলেন-"নিশ্চয় তোমাদের উপর তাদের অধিকার রয়েছে যেমন তাদের উপর তোমাদের রয়েছে অধিকার"। যদি আমরা ইসলামের সমুদয় দিক-নির্দেশনা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করি তাহলে আমাদের নারী সমাজ সকল প্রকার সহিংসতা থেকে রক্ষা পাবে।

উপসংহার

হিংসা-বিদ্বেষ ও ক্রোধ ইসলামে সমর্থিত নয়। উপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম নারীকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। ইসলামে নারীর প্রতি সহিংসতা সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী নারী সমাজ সহিংসতার শিকার হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে নারীকে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা লক্ষণীয় হচ্ছে। নারীকে বঞ্চনা আর সহিংসতার হাত থেকে রক্ষা করে তাদের যথার্থ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে আল্লাহ্ যে বিধান দিয়েছেন সে সম্পর্কে সকলকে সচেতন হতে হবে। আর সে বিধান অনুসারে শ্রেণী, পেশা, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সুন্দর সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত হল সুন্দর পরিবার গঠন। আর সুন্দর ও সুখী পরিবার গঠনের পূর্বশর্ত হলো নারীর প্রতি হিংসাত্মক আচরণ পরিহার। একটি পরিবারে পুরুষের যেমনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তেমনি নারীরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা মানুষ হিসেবে পুরুষ ও নারীকে সমান মর্যাদা প্রদান করেছেন। অথচ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারী চরম অবহেলা-লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নৈতিক পরিশুদ্ধতা এবং সচেতনতা। নারীকে ইসলাম যে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছে মা হিসাবে, কন্যা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে সে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান নিশ্চিত করতে পারলে ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুক প্রথা, নারী পাচার প্রভৃতি বন্ধ হবে। তাই নারীর প্রতি সকল প্রকার ও অত্যাচার সহিংসতা বন্ধের লক্ষে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা সর্বতোভাবে গ্রহণ করতে হবে।

---

৭২. মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইসমাঈল বলেন, 'ইসলাম নারীদের মাঝে পারস্পরিক বিভেদের প্রাচীর চূর্ণ করে দিয়েছে যেমন পুরুষদের মাঝে বিভেদের প্রাচীর ভেঙে দিয়েছে। ফলে সকলেই ইসলামের প্রতি অনুগত হয়েছে এবং সকল ব্যক্তির নিজস্ব মর্যাদা সমান হয়েছে'।
দ্র. *আল-মার'আতু বায়না তাকরীমিল ইসলাম ওয়া ইহানাতিল জাহিলিয়্যাহ্* আল-কাহেরা : দারু ইবনুল জাওযী, ১৪২৬, পৃ. ২১৪

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮, সংখ্যা-২৯
জানুয়ারী-মার্চ : ২০১২

ইসলামে সাক্ষ্য আইন : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম*

[সারসংক্ষেপ : ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের সর্ববিধ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ঘোষিত হয়েছে এই জীবনব্যবস্থায়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জনগণের মধ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামী বিচার ব্যবস্থার লক্ষ। বিচার বিভাগের নিকট ন্যায়বিচার পাওয়া জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত। তাই তো পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ তাকীদ রয়েছে। আর সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার জন্য নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আবশ্যক। ইসলামী বিচারব্যবস্থায় এই প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য নিরপেক্ষ সাক্ষ্যের বিধান রাখা হয়েছে, যা সাক্ষ্য আইন হিসেবে পরিচিত। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে সাক্ষ্যের সংজ্ঞা, সাক্ষ্যের সাধারণ শর্তাবলী, সাক্ষ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা, মহিলাদের সাক্ষ্য, অমুসলিমের সাক্ষ্য, সাক্ষীর সংখ্যা, মিথ্যা সাক্ষ্যদানের শাস্তি, সাক্ষীগণের বক্তব্যে গরমিল, সাক্ষ্য প্রত্যাহারের বিধান ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।]

সাক্ষ্যের সংজ্ঞা

সাক্ষ্য এর আরবী প্রতিশব্দ الشهادة : যার অর্থ উপস্থিতি, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, প্রত্যক্ষ দর্শন, প্রমাণ উপস্থাপন, অকাট্য খবর বা সংবাদ দেয়া।[১] 'মুজামুল মুসতালাহাত ওয়া আলফাযিল ফিকহিয়্যাহ' গ্রন্থে শাহাদাত শব্দের অর্থে বলা হয়েছে- الاعلام والحضور অর্থাৎ অবহিত করা ও উপস্থিত হওয়া। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে- الغنيمة لمن شهد الوقعة إلى حضرها অর্থাৎ রণক্ষেত্রে সশরীরে উপস্থিত ব্যক্তিই যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকারী হবে।[২] ইংরেজিতে সাক্ষ্য শব্দের প্রতিশব্দ Evidence, যা একটি ল্যাটিন শব্দ Evidens or Eviders শব্দ হতে নির্গত, যার অর্থ স্পষ্ট দেখা, স্পষ্ট দৃষ্টি, স্পষ্ট আবিষ্কার বা নির্ধারণ করা বা প্রমাণ করা।[৩] ইসলামী পরিভাষায় অধিকার

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইবনে মানজুর, *লিসানুল আরব*, আল-কাহেরা, দারুল হাদীস, ২০০৩ খ. ৫, পৃ. ২১৫

২. ড. মাহমুদ আব্দুর রহমান আব্দুল মুনঈম, *মুজামুল মুসতালাহাত ওয়া আলফাযিল ফিকহিয়্যাহ*, আল-কাহেরা, তা. বি. খ. ২, পৃ. ৩৪৪

৩. বাসুদেব গাঙ্গুলী, *সাক্ষ্য আইন*, ঢাকাঃ আলীগড় লাইব্রেরী, ১৯৯৮, পৃ. ১

প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদালতে উপস্থিত হয়ে "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি" শব্দ প্রয়োগ করে কোন ব্যক্তি কর্তৃক যথার্থ সংবাদ প্রদানকে সাক্ষ্য বলে। আর এই সংবাদ বা সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তিকে 'সাক্ষী' বলে।[৪]

সাক্ষ্যের সংজ্ঞায় আরো বলা হয়েছে, বিচারকের সামনে এবং বাদী ও বিবাদী উভয়ের অথবা কোন এক পক্ষের উপস্থিতিতে তাদের একজনের উপর অন্যজনের প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা বা কোন অপরাধ প্রমাণের জন্য "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি" শব্দ প্রয়োগ করে সংবাদ প্রদান করাকে সাক্ষ্য বলে।[৫]

মুফতী আমীমুল ইহসান সাক্ষ্যের সংজ্ঞায় বলেন, সাক্ষ্য হচ্ছে বিচারকের মজলিসে উপস্থিত হয়ে কোন প্রাপ্য সম্পর্কে একজনের পক্ষে এবং অন্যজনের বিপক্ষে 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি' বলে সংবাদ উপস্থাপন করা।[৬]

বাংলাদেশে কার্যকর ১৮৭২ সালে প্রণীত সাক্ষ্য আইনে সাক্ষ্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "আদালতে যে ঘটনার বিষয়ে বিচার বা তদন্ত হচ্ছে, সে সম্পর্কে সাক্ষীর যেসব বিবৃতি দেয়ার জন্য আদালত অনুমতি দেয় বা তার যেই সব বিবৃতি আদালতের প্রয়োজন হয় এই সব বিবৃতিকে বলা হয় মৌখিক সাক্ষ্য, আর যে সকল দলীল আদালত কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য উপস্থাপন করা হয়, এই সব দলীলকে বলা হয় দালিলিক সাক্ষ্য।"[৭]

সাক্ষ্যের সাধারণ শর্তসমূহ

সুষ্ঠু ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ অত্যন্ত জরুরী। আর নির্ভরযোগ্য প্রমাণের জন্য যথার্থ সাক্ষ্য একান্ত প্রয়োজন। তাই ইসলামী শরীয়ত সাক্ষ্য প্রমাণের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত ও নীতিমালা নির্ধারণ করেছে। কোন ব্যক্তির মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ থাকলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

১. বিবেকবান হওয়া : সাক্ষীগণকে অবশ্যই বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। বিবেক বুদ্ধিহীন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সাক্ষী হওয়ার মানেই হল ঘটনাটিকে ভালভাবে অনুধাবন করা এবং তা স্মরণ রাখা। আর বোধশক্তি ও স্মৃতি শক্তিহীন

---

৪. ড. ওয়াহাবা আয-যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৮৯, খ. ৬, পৃ. ৫৫৬

৫. মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, *আত-তারিকাতুল ফিকহিয়্যাহ*, করাচী: মাকতাবা মীর মুহাম্মদ, ১৯৮৬, পৃ.৩৪২

الشهادة هي اخبار عن عيان بلفظ الشهادة فى مجلس القاضي بحق للغير على الاخر

৬. প্রাগুক্ত

৭. বাসুদেব গাঙ্গুলী, *সাক্ষ্য আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

ব্যক্তির পক্ষে এটা সম্ভব নয়। সুতরাং সকল ফকীহ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, সাক্ষীগণকে বোধশক্তি সম্পন্ন হতে হবে।[৮] মহানবী স. বলেছেন, "তুমি ঘটনাটি প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় জানলেই কেবল সাক্ষ্য প্রদান কর, অন্যথায় বিরত থাক"।[৯]

২. বালেগ হওয়া : সাক্ষীকে অবশ্যই বালেগ তথা প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। এ ব্যাপারে ফকীহগণ একমত পোষণ করেন। নাবালেগ ব্যক্তি বোধশক্তি সম্পন্ন হলেও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[১০]

৩. ঘটনাটি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা : সাক্ষীকে সাক্ষ্যকৃত বিষয় বা ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখতে হবে। সুতরাং অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সে বাদী ও বিবাদীকে চিহ্নিত করতে পারে না। কণ্ঠস্বর দিয়ে অনেক সময় অন্ধব্যক্তি বাদী-বিবাদীকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হলেও তা সন্দেহমুক্ত নয়। তবে ইমাম শাফেঈ র.-এর মতে যে সব ক্ষেত্রে সরাসরি দেখার প্রয়োজন হয় না সেসব ক্ষেত্রে অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

৪. মুসলমান হওয়া : সাক্ষীকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। মুসলমানদের বিষয়ে অমুসলিমদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। তবে অমুসলিমগণ পরস্পরের বিষয়ে সাক্ষী হতে পারবে।[১১]

৫. স্বাধীন হওয়া : সাক্ষীকে স্বাধীন হতে হবে। এ ব্যাপারে হানাফী, শাফেঈ ও মালিকী ফকীহগণ একমত। কারণ পরাধীন ব্যক্তি কারো অভিভাবক হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আর সাক্ষ্যের মধ্যে অভিভাবকত্বের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, "আল্লাহ উপমা দিয়েছেন অপরের অধিকারভুক্ত একজন দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না"।[১২]

৬. বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া : সাক্ষীকে অবশ্যই বাকশক্তির অধিকারী হতে হবে। বাকশক্তিহীন ব্যক্তি সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এ ব্যাপারে হানাফী, শাফেঈ ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ একমত। তবে মালিকী মাযহাব অনুসারে বাকশক্তিহীন ব্যক্তির সুস্পষ্ট ইশারা ইঙ্গিতে প্রদত্ত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[১৩]

---

[৮]. ড. ওয়াহ্বাবা আয-যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬২

[৯]. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, খ. ১, ভাগ. ২, পৃ. ২৫৭

[১০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৩

[১১]. প্রাগুক্ত

[১২]. আল-কুরআন, ১৬ : ৭৫ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

[১৩]. ইবনে কুদামা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, *আল-মুগনী*, আল-কাহেরা : তা. বি., খ. ৯, পৃ. ১১০

৭. ন্যায়পরায়ণ হওয়া : সাক্ষীকে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী হতে হবে। সমাজে মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও পাপাচারী হিসাবে পরিচিত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, "এবং তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে"।[১৪]

৮. সাক্ষীর সংখ্যা কমপক্ষে দু'জন হওয়া : ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কিত ঘটনা ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে সাধারণত কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী থাকতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাযী তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, যদি দু'জন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রী লোক"।[১৫] মহানবী স. বাদীকে দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করতে নির্দেশ দিয়ে বলেন, "তোমরা দু'জন সাক্ষী উপস্থিত কর, অন্যথায় বিবাদীর শপথের উপর নির্ভর কর"।[১৬]

৯. সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের মধ্যে মিল থাকা : একাধিক সাক্ষীর বিবৃতিতে পরস্পরের মধ্যে মিল থাকতে হবে এবং যে বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করা হবে তার সাথে সাক্ষ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এরূপ না হলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে, শব্দগত ও ভাবার্থগত উভয়দিক থেকেই মিল থাকতে হবে, আর ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র.-এর মতে শুধু ভাবার্থগত মিল থাকাই যথেষ্ট।[১৭]

১০. 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি' শব্দ প্রয়োগে সাক্ষ্য প্রদান করা : সাক্ষীগণকে 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি' শব্দ যোগে সাক্ষ্য দেয়া শুরু করতে হবে। এ শব্দ ব্যতীত অন্য কোন শব্দ যেমন- 'আমি বর্ণনা করছি', 'আমি তথ্য প্রদান করছি' বা 'আমি অবহিত করছি' অথবা অনুরূপ অর্থবোধক শব্দ দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান শুরু করা যাবে না।[১৮]

১১. সাক্ষ্যদানের বিষয়ে সাক্ষীগণের জানা থাকা : সাক্ষীগণ যে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবে সে বিষয়ে তাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। অনুমান করে বা কারো মুখের বর্ণনা শুনে সাক্ষ্য প্রদান করা যাবে না।[১৯]

---

[১৪]. আল-কুরআন, ৬৫ : ২ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ

[১৫]. আল-কুরআন, ২ : ২৮২

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

[১৬]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় : আশ-শাহাদাত, অনুচ্ছেদ : ইয়াহলিফুল মুদ্দাআ আলাইহি হাইছুমা ওয়াজাবাত আলাইহিল ইয়ামিনু........, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ২১২

[১৭]. ড. ওয়াহাবা আয-যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী* ওয়া আদিল্লাতুহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩

[১৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৪

[১৯]. আল-কাসানী, *আল-বাদাইউস সানাঈ* ফী তারতীবিশ শারাই, বৈরূত : ১৯৮২, খ. ৬, পৃ. ২৭৭

১২. আদালতে উপস্থিত হওয়া : সাক্ষীগণকে সশরীরে আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। কারণ আদালত সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে রায় প্রদান করে থাকে এবং এই রায়ের মাধ্যমে সাক্ষ্যের কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।[২০]

১৩. সাক্ষী বিরোধী পক্ষের শত্রু না হওয়া : সাক্ষী বিরোধী পক্ষের শত্রু হতে পারবে না। কেননা কোন ব্যক্তি তার শত্রুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানের সুযোগ পেলে শত্রুতার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। তাই মহানবী স. বলেন, "বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাসঘাতকিনী, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনী ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়"।[২১] তিনি আরো বলেন, "শত্রু ও অপবাদযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়"।[২২]

১৪. ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের অপরাধে শাস্তি ভোগকারী না হওয়া : সতী সাধ্বী নারীর প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। কোন ব্যক্তি যদি উল্লিখিত অপরাধে দণ্ডিত হওয়ার পর তাওবা করে তাহলেও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, "এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, এরা তো ফাসিক"।[২৩]
তবে অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতে, যদি তাওবা করে সংশোধন হয় তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে।[২৪]

১৫. সাক্ষ্য নিঃস্বার্থ ও প্রভাবমুক্ত হওয়া : সাক্ষ্যদান সব সময় নিঃস্বার্থ ও প্রভাবমুক্ত হতে হবে। সাক্ষী সব সময় প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই সাক্ষ্য দিবে অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমরা সঠিক সাক্ষ্য প্রদান কর"।[২৫] আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, "হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ

---

[২০]. প্রাগুক্ত

[২১]. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-কাযা, অনুচ্ছেদ : মান তুরাদু শাহাদাতুহু, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১৪৯০
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ

[২২]. ইমাম মালিক, *আল-মুয়াত্তা*, অধ্যায় : আল-আকযিয়া, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফিশ-শাহাদাত, আল-কাহেরা : দারু ইবনিল হায়সাম, ২০০৫, পৃ. ৩০৩ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ

[২৩]. আল-কুরআন, ২৪ : ৪ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

[২৪]. ড. ওয়াহাবা আয-যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী*, ওয়া আদিল্লাতুহু, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৫৬৭

[২৫]. আল-কুরআন, ৬৫ : ২ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

তোমাদের যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, তোমরা সুবিচার করবে এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে,তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন"।[২৬]

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অন্য কোন স্বার্থ থাকতে পারে না। মহানবী স. বলেন, "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করে স্বার্থ হাসিল করতে চায় অথবা ঋণ মুক্ত হতে চায় তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়"।[২৭]

ইসলাম সাক্ষীগণের এতটা প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষ হওয়ার শর্তারোপ করে যে, পিতা-পুত্রের পক্ষে বা পুত্র পিতা-মাতার পক্ষে এবং স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের অনুকূলে সাক্ষী হতে পারে না।

সাক্ষ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা

কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিকে বাদী সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আহবান করলে তার জন্য সাক্ষ্য দেয়া বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। এহেন অবস্থায় সাক্ষ্যদান থেকে বিরত থাকা পাপের শামিল। মহান আল্লাহ বলেন, "সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে"।[২৮] অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা সাক্ষ্য গোপন কর না, যে তা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপী"।[২৯]

তবে বাদী যদি সাক্ষীকে সাক্ষ্য প্রদান করতে না ডাকে তবে স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দেয়া বাধ্যতামূলক নয়। কারণ সাক্ষ্যের দ্বারা তো বাদীরই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু যদি বাদী অবগত না থাকে যে, অমুক ব্যক্তি ঘটনা সম্পর্কে অবগত তবে সেক্ষেত্রে জ্ঞাত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য প্রদান করবে। যদি তা না করা হয় তাহলে সাক্ষ্য গোপন করার কারণে বাদী তার অধিকার হতে বঞ্চিত হবে। আর এ কারণে জ্ঞাত ব্যক্তি গুনাহগার হবে। আল্লাহ বলেন, "আর তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য প্রদান কর"।[৩০]

---

[২৬]. আল-কুরআন, ৫ : ৮

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

[২৭]. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

[২৮]. আল-কুরআন, ২ : ২৮২ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

[২৯]. আল-কুরআন, ২ : ২৮৩ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

[৩০]. আল-কুরআন, ৬৫ : ২ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

আর হদ্দের[৩১] আওতাভুক্ত যেসব বিষয় সরাসরি আল্লাহর অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট সেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয় অবগত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে সাক্ষ্য প্রদানও করতে পারে আবার সাক্ষ্য গোপনও করতে পারে। যেমন চারজন লোক দু'জন নারী-পুরুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত অবস্থায় দেখল, এক্ষেত্রে তারা ইচ্ছা করলে ঘটনাটি গোপন রাখতে পারে। যেমন মহানবী স. মাইয আল-আসলামীর ঘটনা প্রসঙ্গে সাক্ষীকে লক্ষ করে বলেছিলেন, "তুমি যদি বিষয়টি তোমার পরিধেয় কাপড় দ্বারা লুকিয়ে রাখতে তাহলে তোমার জন্য উত্তম হতো।[৩২] মহানবী স. আরো বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের অপরাধ গোপন রাখে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন"।[৩৩]

স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য

যে সকল ক্ষেত্রে অপরাধ হদ্দ ও কিসাসের[৩৪] আওতাভুক্ত সে সকল ক্ষেত্রে স্ত্রী লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম যুহরী র. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ও তাঁর দু'জন মহান খলীফার যুগ হতে এ নীতি চলে আসছে যে, হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য নেই।[৩৫]

তবে হদ্দ ও কিসাসের আওতাভুক্ত অপরাধ যদি কোন কারণে তাযীরের[৩৬] আওতাভুক্ত হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। যেমন চুরির ক্ষেত্রে অপরাধ হদ্দের পর্যায়ভুক্ত না হলে সে ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[৩৭]

হদ্দ ও কিসাস ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। যেমন বিবাহ, তালাক, ওকালা ও দিয়াত,ওয়াক্ফ,সন্ধি,হেবা, স্বীকারোক্তি, ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি।[৩৮] নারীদের একান্ত গোপনীয় বিষয়ে শুধু নারীদের সাক্ষ্য, এমনকি

---

৩১. হদ্দ হলো এমন এক প্রকার শাস্তি যার সীমা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া রয়েছে। যেমন ব্যভিচারের শাস্তি, চুরির শাস্তি, মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি, মদ্যপানের শাস্তি ও ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি। [গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামের দণ্ডবিধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২]

৩২. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-হুদুদ, অনুচ্ছেদ : আস-সাতরু আলা আহলিয যিম্মাতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪২

৩৩. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়, আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : আল-মাউনাহ লিল-মুসলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮৫

৩৪. খুনের মামলায় জীবনের বিনিময়ে জীবনগ্রহণ করাই কিসাস। [গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামের দণ্ডবিধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২]

৩৫. হাসান আলী ইবনে আবূ বকর, আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়া*, দেওবন্দ: কুতুবখানা রহিমিয়া, তা. বি., অধ্যায় : আশ-শাহাদাত, খ. ৩, পৃ. ১৩৮

৩৬. তাযীর হলো এমন শাস্তি যার পরিমাণ ও ধরন আদালতের সুবিবেচনার উপর নির্ভর করে।

৩৭. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতওয়া আলমগীরী*, অধ্যায় : আশ-শাহাদাত, তা. বি., খ. ৪, পৃ. ৪৬৫

৩৮. আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়া*, অধ্যায় : আশ-শাহাদাত, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩৮-১৩৯

একজন নারীর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। যেমন কোন নারী বাকিরা (কুমারী) কিনা, কোন নারীর ঋতুকাল শেষ হয়েছে কিনা, কোন নারীর মধ্যে বিশেষ কোন দৈহিক ত্রুটি আছে কিনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এমনকি একজন নারীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বৈধ।

যে কোন সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীদের বাড়ির বাইরে গমন তুলনামূলক ভাবে কম। বিশেষত ইসলামী সমাজব্যবস্থায় নারীর বহিরাঙ্গনে যাওয়া পুরুষের তুলনায় কম। ইসলামী আইন সর্বাবস্থায় নারীকে মামলা মোকদ্দমার মত ঝামেলাপূর্ণ ও বিবদমান বিষয়ের সাথে পারতপক্ষে জড়াতে চায় না। তাছাড়া নারীগণ সৃষ্টিগত ভাবেই কোমল হৃদয় ও নম্র স্বভাবের হওয়ার কারণে বিবাদ বিশৃংখলা ও উত্তেজনার পরিস্থিতিতে দেখলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তার এই স্বভাবগত দুর্বলতার কারণে তাদেরকে হদ্দ এর আওতাধীন বিষয়ে সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। এটা নারীর জন্য শরীয়তের পক্ষ থেকে এক প্রকার দায়মুক্তি।[৩৯]

অমুসলিম নাগরিকের সাক্ষ্য

মুসলিমদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অমুসলিমগণের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে সব মাযহাবের ফকীহগণ একমত। কারণ সাক্ষ্য হচ্ছে একধরনের অভিভাবকত্ব। আর কাফিররা মুসলমানদের অভিভাবক হতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ মুমিনদের উপর কাফিরদের কোন পথ অবশিষ্ট রাখেন নি"।[৪০] হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ শুধু একটি ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিষয়ে অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেন তা হলো, সফররত অবস্থায় যদি কোন মুসলিম মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তার ওসিয়াতের পক্ষে দু'জন মুসলিম সাক্ষী না পাওয়া যায় তবে সেই ক্ষেত্রে দু'জন অমুসলিম ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে নির্ধারণ করা যাবে।[৪১] তারা পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদার ১০৬ নং আয়াত দলিল হিসাবে পেশ করেন। আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; তোমরা সফরে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যুর বিপদ উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী মনোনীত করবে"।[৪২]

---

[৩৯]. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮-২৬৯

[৪০]. আল-কুরআন, ৪: ১৪১ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.

[৪১]. ড. ওয়াহাবা আয-যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ.

[৪২]. আল-কুরআন, ৫ : ১০৬

তবে অমুসলিমদের পারস্পরিক ব্যাপারে একই ধর্মের অনুসারী না হলেও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "যারা কাফের তারা পরস্পর পরস্পরের অভিভাবক"।[৪৩] যেহেতু সাক্ষ্য প্রদান করা অভিভাবকত্বের শামিল তাই তারা পরস্পরের অভিভাবক হতে পারে। তাছাড়া তাদের মধ্যেও যে বিশ্বস্ত লোক আছে তা কুরআন মজীদ স্বীকার করে। যেমন, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন লোকও আছে যাদের নিকট তুমি সম্পদের স্তূপ আমানত রাখলেও তারা তা তোমাকে ফেরত দিয়ে দিবে"।[৪৪] মহানবী স. অমুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষী হওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বর্ণিত হাদীসটি প্রমাণ বহন করে। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, "মহানবী স. অমুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষী হওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন"।[৪৫]

সাক্ষীর সংখ্যা দুই এর কম হলে করণীয়

হানাফী ফকীহগণের মতে, বাদী যদি মাত্র একজন সাক্ষী উপস্থিত করতে সক্ষম হয় তবে তার উপর ভিত্তি করে রায় প্রদান করা জায়েয হবে না। কেননা আল্লাহ রব্বুল আলামীন কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করার কথা বলেছেন। এ অবস্থায় বাদীকে তার দাবীর পক্ষে শপথও করানো যাবে না। কারণ রসূল স. বলেছেন, "বাদীকে সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে এবং বাদীর দাবি অস্বীকারকারীকে শপথ করানো হবে"।[৪৬] অন্যত্র উল্লেখ আছে, "বিবাদী শপথ করবে"। মহানবী স. বাদীকে লক্ষ করে আরো ঘোষণা করেছেন, "হয় তোমার দু'জন সাক্ষী উপস্থিত কর অন্যথায় তার (বিবাদীর) শপথ দ্বারা ফয়সালা করা হবে"।[৪৭]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ

[৪৩]. আল-কুরআন, ৮ : ৭৩ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

[৪৪]. আল-কুরআন, ৩ : ৭৫ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ

[৪৫]. ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আশ-শাহাদাত, অনুচ্ছেদ : শাহাদাতু আহলিল কিতাবি বা'যিহিম আল-বা'য, আল-কুতুবুস সিত্তাহ : দারুস সালাম, ২০০০, ২৬১৯

[৪৬]. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী আন্নাল বায়্যিনাতা আল-মুদ্দা আলাইহি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১৭৮৬

[৪৭]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আশ-শাহাদাত, অনুচ্ছেদ : ইয়াহলিফুল মুদ্দাআ আলাইহি হাইছুমা ওয়াজাবাত আলাইহিল ইয়ামিনু, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ২১২

সুতরাং বোঝা গেল যে, বাদী দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে বিবাদীকে শপথ করে বলতে হবে যে, বাদীর দাবি সত্য নয় এবং তিনি শপথ করতে সম্মত না হলে বাদীর দাবি প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাব মতে মালসম্পদ সম্পর্কিত মামলায় বাদী একজন সাক্ষী উপস্থিত করতে সক্ষম হলে তাকে (বাদীকে) তার দাবির সপক্ষে শপথ করাতে হবে। তিনি শপথ করলে একজন সাক্ষী ও শপথের ভিত্তিতে বিচারক রায় প্রদান করতে পারবেন। কারণ মহানবী স. একজন সাক্ষী ও বাদীর শপথের ভিত্তিতে রায় প্রদান করেছেন।

মিথ্যা সাক্ষ্যদানের শাস্তি

মিথ্যা সাক্ষ্যদান আল্লাহর সাথে শিরক করার মত জঘন্য অপরাধ। কারণ এর মাধ্যমে নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তির সম্মুখীন হয় বা আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হয় এবং বাদী তার সঠিক প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়। মহানবী স. মিথ্যা সাক্ষ্যকে শিরকের সাথে তুলনা করে একদিন ফজরের নামাযের পরে সাহাবীদের লক্ষ করে দেয়া ভাষণে বলেন, "মিথ্যা সাক্ষ্যদানকে আল্লাহর সাথে শরীক করার সমতুল্য অপরাধ গণ্য করা হয়েছে। একথা তিনি তিনবার বললেন"।[৪৮] অতঃপর তিনি পবিত্র কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা বলা থেকে"।[৪৯]

ইমাম আবু হানীফা র. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীর শাস্তি হিসাবে উল্লেখ করেন, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীকে আসরের নামাযের পরে বাজারে ঘুরানো হবে এবং বলা হবে যে, এ ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে, অতএব লোকেরা যেন মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান থেকে বিরত থাকে"।[৫০]

ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র.-এর মতে, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে বেত্রাঘাত করতে হবে এবং তাওবা করে সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত হাজতে আটক রাখতে হবে।[৫১]

শাফিঈ মাযহাবের ইমামগণ বলেন, বেত্রাঘাত, হাজতবাস, তিরস্কার, জনতার সামনে অপমান ইত্যাদি যে ধরনের শাস্তি বিচারক উপযুক্ত মনে করবেন মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীকে সে ধরনের শাস্তি প্রদান করবেন। আর মালিকী মাযহাব মতে, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীর জন্য একসাথে তিনটি শাস্তি প্রদান করতে হবে। যেমন বেত্রাঘাত, লোকসম্মুখে ঘুরানো ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের ঘোষণা প্রদান এবং কারাবাস।[৫২]

---

৪৮. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-কাযা, অনুচ্ছেদ : ফী শাহাদাত আয-যূর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯০

৪৯. আল-কুরআন, ২২:৩০ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

৫০. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

৫১. ড. ওয়াহাবা আয- যুহায়লী, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৫৮২-৮৩

৫২. *প্রাগুক্ত*

সাক্ষীগণের বক্তব্যে পার্থক্য

সাক্ষ্য প্রদানের সময় সাক্ষীগণের পরস্পরের বক্তব্যের মধ্যে মিল থাকা বাঞ্চনীয়। তবে শব্দগত পার্থক্য থাকলেও যদি বিষয়বস্তুর মধ্যে মিল থাকে তবে সেই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন একজন সাক্ষী বলল, অমুকের সাথে অমুকের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে এবং অন্য একজন সাক্ষী বলল, অমুক ব্যক্তি অমুককে বিবাহ করেছে। এই ক্ষেত্রে শব্দগত পার্থক্য হলেও বিষয়বস্তুর মধ্যে মিল রয়েছে। সুতরাং এধরনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. এ অভিমত পোষণ করেন।[৫৩] তবে ইমাম আযম আবু হানীফা র.-এর মতে, সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের মধ্যে শব্দগত ও অর্থগত উভয় দিক দিয়ে মিল থাকতে হবে। অন্যথায় সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[৫৪]

সাক্ষ্য প্রত্যাহার ও এর ফলাফল

কোন সাক্ষী তার সাক্ষ্যের দ্বারা আদালতে যা প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তার সেই সাক্ষ্য স্বেচ্ছায় আদালতের মাধ্যমে প্রত্যাহার করাকে 'সাক্ষ্য প্রত্যাহার' বলে।[৫৫] সাক্ষী তার সাক্ষ্য এভাবে প্রত্যাহার করবে, 'আমি যে সাক্ষ্য প্রদান করেছিলাম তা প্রত্যাহার করলাম', অথবা আমি ইতঃপূর্বে যে সাক্ষ্য প্রদান করেছি তা মিথ্যা অথবা আমি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেছি। আদালতের সামনে এরূপ বাক্য উল্লেখ করে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করতে হবে। আদালতের বাইরে বা অন্যত্র সাক্ষ্য প্রত্যাহার গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেছে সেই আদালত ব্যতীত অন্য আদালতে সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে তা কার্যকর হবে।

সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আদালত রায় প্রদানের পূর্বে তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে তাদেরকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বা শাস্তি ভোগ করতে হবে না। কারণ রায় প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত বিবাদীর উপর কোন প্রকার দায় বর্তায় না। অবশ্য এক্ষেত্রেও আদালত বিবেচনা করে সাক্ষীগণকে সাক্ষ্য প্রত্যাহারের ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী শাস্তি প্রদানের হুকুম দিতে পারেন।[৫৬] আর রায় প্রদানের পর যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা হয় এবং মামলা যদি মালামাল সম্পর্কিত হয় তাহলে সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে এবং মোকদ্দমা যদি মানবদেহ বা

---

৫৩. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

৫৪. প্রাগুক্ত

৫৫. প্রাগুক্ত, ২৯৪

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

মানব প্রাণের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে হয় তবে সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীকে অপরাধের ধরন অনুযায়ী দিয়াত প্রদান করতে হবে। যেমন দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় হত্যা করেছে। আদালত তার সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলেন এবং এই রায় কার্যকর করা হল। এর পর সাক্ষীদ্বয় আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল। এক্ষেত্রে সাক্ষীদ্বয় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির পরিবারকে দিয়াত প্রদান করবে এবং আদালত ইচ্ছা করলে অতিরিক্ত অন্য কোন শাস্তিও প্রদান করতে পারে।[৫৭]

উপসংহার

মানুষ সর্বদা সত্য অন্বেষণ করে, অজানাকে জানার চেষ্টা করে। বিচারকার্যে সত্যান্বেষণের পথ ও পদ্ধতির নির্দেশ দেয় সাক্ষ্য আইন। সাক্ষ্য আইন বিচারককে বিচারের সময় কতদুর বিবেচনার পরিধি প্রসারিত করতে হবে এবং কোন কোন দিক বর্জন করতে হবে তার নির্দেশনা দিয়ে সত্য নিরূপণে সহায়তা করে। সাক্ষ্য আইন বিচারের সময় কোন কোন শ্রেণীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য তা স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে এবং গ্রহণযোগ্য বিষয় কিভাবে প্রমাণ করতে হবে তার বিধান বর্ণনা করে। সর্বোপরি প্রমাণ কিভাবে আদালতে উপস্থিত করতে হবে সাক্ষ্য আইন তার নির্দেশনা দিয়ে বিচারকার্যকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়ন করে। সকল বিচার কার্যের উদ্দেশ্য ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। এই ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সাক্ষ্য আইন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় সত্যের উদঘাটন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য নিরপেক্ষ ও সত্য সাক্ষ্যের বিধান রাখা হয়েছে। নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু বিচার যেহেতু সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল তাই ইসলামী শরীয়ত সাক্ষ্য প্রমাণের ক্ষেত্রে যেসব নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে এগুলো অনুসৃত হলে বিচারকালে স্বচ্ছতা বলিষ্ঠ হবে। বর্তমানে কোন রাষ্ট্র যদি উল্লিখিত নীতিমালার আলোকে বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করে ইসলামের বিধানানুযায়ী রায় প্রদান করে,তাহলে দেশ থেকে জুলুম, অবিচার ও ফিতনা-ফাসাদ চিরতরে দুর হবে বলে দৃঢ়ভাবে আশা করা যায়।

---

[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮, সংখ্যা-২৯
জানুয়ারী-মার্চ : ২০১২

ইসলামী আইনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান ও সংযোজন: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক*

[সারসংক্ষেপ: *মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন চিকিৎসাপদ্ধতির উন্নতির একটি বিস্ময়কর সাফল্য। চিকিৎসা বিজ্ঞান দীর্ঘদিনের গবেষণা ও প্রায়োগিক নিরীক্ষার মাধ্যমে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন বিষয়ক জ্ঞান বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতা পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও উৎকর্ষে ইসলামের মৌলিক অবদান রয়েছে। ইসলাম জীবন রক্ষায় অঙ্গদান ও মানবদেহে তা সংযোজন করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে এ সম্পর্কিত বিধান প্রয়োগে কিছু নীতি আরোপ করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখিত বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, শরীয়তের লক্ষ-উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান ও সংযোজনের নৈতিক দিকও আলোচনায় স্থান পেয়েছে।*]

বর্তমান বিশ্বের চিকিৎসা শাস্ত্রে অঙ্গদান ও সংযোজন একটি সুপরিচিত বিষয়। মানবদেহের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেললে বা বিনষ্ট হয়ে গেলে ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবন যাপনে ব্যাঘাত ঘটে। ক্ষেত্রবিশেষে জীবনাবসান অবধারিত হয়ে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দীর্ঘ গবেষণা এবং চিকিৎসকদের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে এমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা প্রদান সফলতার এক প্রান্তে উপনীত হয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান ও প্রতিস্থাপন ক্ষেত্রে প্রথমত হাড়, দাঁত এবং কর্ণিয়াতে সফলতা আসে। পরবর্তীতে কিডনী, হার্ট, ফুসফুস এবং লিভার বা যকৃত এবং আরো কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনে সফলতা আসে। উন্নত বিশ্বে এ সেবা অনেক পূর্বে শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে তা বিভিন্ন দেশের চিকিৎসা সেবায় সংযোজিত হচ্ছে। চিকিৎসাপদ্ধতির উন্নয়ন ও বিকাশের ধাপে ধাপে অঙ্গদান ও অঙ্গ সংযোজনের ক্ষেত্রে সাধারণত একটি ঝুঁকির মোকাবিলায় আরেকটি ঝুঁকি গ্রহণে কোনটি লাভজনক তা বিবেচনা করার নীতিকে অনুসরণ করা হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যোগান ও সংযোজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা থাকায় বিভিন্ন দেশের সমাজ ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন আইন অনুমোদিত হয়েছে। বাংলাদেশেও এ সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিকাশমান ধারায় ভবিষ্যতে প্রতিস্থাপনের প্রযুক্তি ক্লোনকৃত কৃত্রিম

---

* এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অঙ্গ ও প্রযুক্তিভিত্তিক হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। সে ক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও সামাজিক চাহিদার আলোকে প্রচলিত আইনে নতুন সংযোজন ও বিয়োজন ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। ইসলাম জীবন রক্ষায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অত্যন্ত সতর্কভাবে অঙ্গদান ও মানবদেহে তা সংযোজন করার ক্ষেত্রে পরিস্থিতির আলোকে মধ্যপন্থী শরয়ী বিধান প্রদান করেছে। তাছাড়া এ বিধান প্রয়োগে চিকিৎসক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দাতা এবং গ্রহীতা ও আত্মীয়-স্বজনদের নৈতিক সীমা ও দায়িত্ব আরোপ করেছে। অঙ্গ দান ও সংযোজন বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, শরীয়ার লক্ষ-উদ্দেশ্য, নৈতিক পরিসর ইত্যাদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াও বাংলাদেশে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান ও সংযোজন আইনের পর্যালোচনা এবং ইসলামী আইনের মানবিকতাকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক পর্যালোচনা করা এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান ও সংযোজন বিষয়ক আইন

মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের জন্য সরকার "মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯" শিরোনামে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান ও সংযোজন বিষয়ক আইন প্রণয়ন করে। এ আইনের লক্ষ-উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে শুরুতেই বলা হয় 'যেহেতু মানবদেহে সংযোজনের নিমিত্তে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও এর আইনানুগ ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এত দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল।" এ আইনটি সংক্ষিপ্ত শিরোনামা, সংজ্ঞা, জীবিত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান, মৃত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিযুক্তকরণ, ব্রেইন ডেথ ঘোষণা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দাতা ও গ্রহীতার যোগ্যতা, মেডিকেল বোর্ড, রেজিস্টার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি নিষিদ্ধ, দণ্ড, বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ইত্যাদি সর্বমোট এগারটি ধারায় বিধৃত হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তি তার নিজের শরীরের কিডনি, হৃৎপিণ্ড, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, অস্থি, অস্থিমজ্জা, চক্ষু, চর্ম ও টিস্যুসহ মানবদেহে সংযোজনযোগ্য যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্যের শরীরে প্রতিস্থাপনের জন্য দান করতে পারে।[১] নিম্নে আইনটির উপর একটি সারনির্যাস তুলে ধরা হলো।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দাতার যোগ্যতা

উক্ত আইনের তৃতীয় ধারায় বলা হয়েছে, সুস্থ ও সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি তার দেহের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যা বিযুক্তির কারণে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ব্যাঘাত সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না তা আত্মীয়দের দেহে সংযোজনের জন্য দান করতে পারে। এ আইনের চতুর্থ ধারায় বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর আগে যদি শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উইল করে থাকে তবে মৃত্যুর পর তার শরীর থেকে উইল করা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় দাতার বয়স আঠারো বছরের কম

---

১ *মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯, ধারা ১, ২*

হলে ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কারো দেহে সংযোজন করা যাবে না। তবে দাতা ও গ্রহীতা ভাই-বোন সম্পর্কের হলে এ শর্ত কার্যকর হবে না। তদ্রূপ পঁয়ষট্টি বছরের ঊর্ধ্বেও কোন মৃত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করা যাবে না। চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দানকৃত অঙ্গের কার্যকারিতা অক্ষুণ্ন না পেলে দানকৃত অঙ্গ দাতার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে না। সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকারিতা কোন কারণে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, চর্ম বা মস্তিষ্কের প্রাইমারি ক্যান্সার ব্যতীত অন্য যে কোন ধরনের ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এইচআইভি বা হেপাটাইটিস ভাইরাসজনিত কোন রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, জীবাণু সংক্রমণজনিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্যের দেহে সংযোজন করা যাবে না।[২]

গ্রহীতার যোগ্যতা

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রহীতার বয়স অবশ্যই দুই বছরের বেশি বা সত্তর বছরের কম হতে হবে। যেসব রোগের কারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের সাফল্য বিঘ্নিত হতে পারে গ্রহীতাকে সেসব রোগ থেকে মুক্ত হতে হবে।[৩]

চিকিৎসক বোর্ড ও পরামর্শ

উক্ত আইনের পঞ্চম ধারার অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে নিউরোলজী অথবা ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনে বিশেষজ্ঞ অন্যূন তিনজন চিকিৎসক যৌথভাবে কোন ব্যক্তির ব্রেইন ডেথ ঘোষণা করতে পারবেন। উক্ত বোর্ড একজন অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক বা সমপদমর্যাদা সম্পন্ন কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে ঘঠিত হবে। অন্য দু'জন সহযোগী অধ্যাপক বা সহকারী অধ্যাপক অথবা সমপদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে বোর্ড ঘটিত হবে। ব্রেইন ডেথ ঘোষণাকারী কোন চিকিৎসক কিংবা তার কোন নিকট আত্মীয় যে ব্যক্তির ব্রেইন ডেথ ঘোষণা করা হবে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য কোন ব্যক্তির দেহে সংযোজন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকতে পারবে না। ব্রেইন ডেথ ঘোষণার পূর্বে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বয়সভেদে শর্তারোপ করা হয়েছে। আইনের সপ্তম ধারায় বলা হয়েছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনকারী প্রত্যেক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করতে হবে। এ বোর্ডে একজন সহযোগী অধ্যাপক অথবা সমপদমর্যাদা সম্পন্ন কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, একজন সহকারী অধ্যাপক অথবা সমপদমর্যাদা সম্পন্ন কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং একজন কনসালট্যান্ট অথবা সমপদমর্যাদা সম্পন্ন কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকবেন। সরকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনকারী প্রত্যেক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোন অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক বা

---

২ *প্রাগুক্ত*, ধারা ৩, ৬

৩ *প্রাগুক্ত*, ধারা ৬

সমপদমর্যাদা সম্পন্ন কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন সমন্বয়কারী নিয়োগ করবে। মেডিকেল বোর্ড অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহ ও সংযোজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে দাতা ও গ্রহীতার যোগ্যতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন সমন্বয়কারী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে অবহিতকরণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[৪]

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ

মানবদেহের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে কোন সুবিধা আদায়, ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন বিজ্ঞাপন ও কোন প্রচারণা চালান যাবে না। এ আইন অমান্য করলে সর্বোচ্চ সাত বছর ও সর্বনিম্ন তিন বছর কারাদণ্ড হতে পারে। এ ছাড়াও তিন লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় প্রকার দণ্ড হতে পারে। কোন চিকিৎসক এ আইনের কোন বিধান লংঘন করলে বা লংঘনে সহায়তা করলে বর্ণিত দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং তার চিকিৎসক রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হবে। এ আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে Criminal Procedure Code, ১৮৯৮ প্রযোজ্য হবে।[৫]

বাংলাদেশে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান ও সংযোজন পরিস্থিতি

সাম্প্রতিকালে বাংলাদেশে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান ও সংযোজন বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের আইনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধু নিকটাত্মীয় তথা স্বামী, স্ত্রী, প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা, ভাই-বোন বা রক্ত সম্পর্কের অন্য আত্মীয়কে দান করতে হয়। যদি এ ধরনের কোন স্বজনের প্রয়োজন না হয় তবে অন্য কাউকে দান করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে অপ্রতুল চিকিৎসা সরঞ্জাম, অভিজ্ঞতা ও জনসচেতনতার অভাবে অঙ্গদানে অনীহা, দাতার স্বল্পতা ও অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া অঙ্গ সংযোজন একটি ব্যয়বহুল চিকিৎসা। সাধারণত অনেকের পক্ষে অর্থাভাবে যথাযথভাবে এ চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবুও বিগত কয়েক দশকে এ চিকিৎসা সেবা যথেষ্ট উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করেছে। নিম্নে বাংলাদেশে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান ও সংযোজনের বিশেষ কয়েকটি দিক আলোচিত হল-

কিডনি সংযোজন

কিডনি দেহের বিস্ময়কর যন্ত্র। কিডনির মূল কাজ হলো মূত্র তৈরি করা ও রক্ত থেকে বর্জ্য শরীর থেকে অপসারণ করা, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা, লোহিত কণিকা তৈরি করা, হাড়কে মজবুত রাখা। এ যন্ত্রের অবস্থান পেটের গভীরে, পাঁজরের খাঁচার নিচে। একজন মানুষের কিডনি অন্য একজন কিডনি-অকেজো রোগীর দেহে

---

[৪] *প্রাগুক্ত*, ধারা ৫, ৭

[৫] *প্রাগুক্ত*, ধারা ৯, ১০

সংযোজন করাকে কিডনি সংযোজন বলা হয়। কিডনি-অকেজো রোগীদের জন্য কিডনি সংযোজন একটি বিকল্প এবং জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসাপদ্ধতি। বর্তমানে পৃথিবীতে কিডনি রোগে আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ রোগে আক্রান্তের হার বেশি। সাম্প্রতিককালে এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রায় ১৭ শতাংশ লোক ক্রনিক কিডনি রোগে আক্রান্ত, অস্ট্রেলিয়ায় এ হার ১৬ শতাংশ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১১ শতাংশ। ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা দীর্ঘস্থায়ী কিডনি অকেজো রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত রোগীর সমান বা বেশি। তবে আশঙ্কার ব্যাপার হল, এ দুটিই দীর্ঘস্থায়ী কিডনি অকেজো রোগের অন্যতম কারণ। ফলে দীর্ঘস্থায়ী কিডনি অকেজো রোগ জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ বলে বিবেচিত। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় দুই কোটি লোক কোন না কোন কিডনি রোগে ভুগছে। প্রতি মিলিয়নে ১২০ থেকে ১৫০ জন মানুষ শেষ পর্যায়ে দীর্ঘস্থায়ী কিডনি অকেজো রোগে আক্রান্ত হয় এবং প্রতি বছর এ রোগে মৃত্যুবরণ করে প্রায় ৩৫ হাজার লোক। গত দশ বছরে কিডনি রোগীর সংখ্যা প্রায় এক কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে।[৬] কোন রোগীর দুটো কিডনি সম্পূর্ণরূপে অকেজো হয়ে গেলে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রথমে ডায়ালাইসিসের প্রয়োজন হয়। রোগীর উপসর্গের ইতিহাস, রক্তের ক্রিয়েটিনিন, ইউরিয়া, ইলেকট্রোলাইট, সনোগ্রাম করে কিডনির অবস্থান ও আকার দেখা, এফজিআর বা সিআর ইত্যাদি পরীক্ষা করে কিডনি অকেজো রোগ নির্ণয় করা হয়। সাধারণত দুই ধরনের ডায়ালাইসিসের প্রচলন আছে। পেরিটোনিয়েল ডায়ালাইসিস ও হেমোডায়ালাইসিস। হেমোডায়ালাইসিস শুরু করার আগে সাধারণত বাম হাতের কবজির ওপর একটি এভি ফিস্টুলা করে নেয়া হয়, যা সমন্বয় হতে এক থেকে দেড় মাস সময় লাগে। হেমোডায়ালাইসিসে যন্ত্রের পাশাপাশি রোগীকে ও তার নিকট-পরিজনকে রোগ সম্পর্কে ধারণা, চিকিৎসার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সুযোগ-সুবিধা ও আর্থিক দিক সম্পর্কেও সম্যক ধারণা দেয়া হয়। এরপরই একজন রোগীর সব দিক বিবেচনা করে কিডনি ডায়ালাইসিস কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুতি নেয়া হয়।[৭] বেসরকারী চিকিৎসাকেন্দ্রে ডায়ালাইসিস চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এতে বছরে প্রায় তিন থেকে চার লাখ টাকা খরচ হয়। অপরদিকে সরকারি হাসপাতালে কিডনি সংযোজনে দেড় লাখ থেকে দুই লাখ টাকা

---

৬. অধ্যাপক হারুন সাহা, *কিডনি সংযোজন ও একটি মানবিক আবেদন*, দৈনিক প্রথম আলো, ১০ মার্চ, ২০১০, পৃ. ৪

৭. অধ্যাপক মো. শহীদুল ইসলাম সেলিম, *বাংলাদেশে কিডনি সংযোজন পরিস্থিতি*, দৈনিক প্রথম আলো, ১০ মার্চ, ২০১০, পৃ. ৪

ব্যয় হয়। তারপর প্রতিবছর আশি হাজার থেকে এক লাখ টাকার ওষুধ প্রয়োজন হয়। চিকিৎসকদের মতে কিডনি সংযোজনই দীর্ঘস্থায়ী কিডনি-অকেজো রোগের আদর্শ চিকিৎসা। ডায়ালাইসিসের মাধ্যমে কখনোই কিডনির সব কাজ সম্ভব নয়। কারণ সুস্থ একটি কিডনিই আরেকটি কিডনির কাজ করতে পারে।

বাংলাদেশে কিডনি সংযোজন সাধারণত দু'টি উৎস থেকে করা হয়। কোন নিকটাত্মীয় কর্তৃক দানকৃত কিডনি এবং কোন মৃত ব্যক্তির দানকৃত কিডনি নিয়ে সংযোজন। সর্বপ্রথম ১৯৫৪ সালে এক যমজ মানবসন্তানের কিডনি অপরজনের শরীরে সফল সংযোজনের মাধ্যমে শুরু হয় কিডনি সংযোজনের পদযাত্রা। দিন দিন উন্নত থেকে উন্নততর সফলতা নিয়ে আজ তা স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, জীবিত আত্মীয়ের কিডনি সংযোজিত ব্যক্তিদের এবং ক্যাডাভারিক অর্গান সংযোজক ব্যক্তিদের এক বছর বেঁচে থাকার হার যথাক্রমে ৯৫ এবং ৮৮ ভাগ। কিন্তু পাঁচ বছর বেঁচে থাকার হার প্রায় ৮৭ ভাগ। ১০ বছর ধরে এর ক্রমাগত উন্নতি লক্ষ করা গেছে। প্রতিনিয়ত কিডনি সংযোজিত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে, পাশাপাশি সংযোজন প্রার্থীর তালিকাও দীর্ঘায়িত হচ্ছে। অঙ্গদানকারীর অপ্রতুলতা এবং ক্যাডাভারিক অঙ্গ সংগ্রহের কিছু বাধা কিডনি সংযোজনে একটি অন্তরায়। বাংলাদেশে আটটি সরকারি ও বেসরকারি সেবাপ্রতিষ্ঠানে সফল কিডনি সংযোজনের মাধ্যমে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। ১৯৮১ সালে প্রথম এক ব্যক্তির দেহে তার বোন প্রদত্ত সফল কিডনি সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশে কিডনি সংযোজন চিকিৎসা সেবার যাত্রা শুরু। ওই রোগীকে প্রথমে পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিসের মাধ্যমে অপারেশনের উপযোগী করে তোলা হয়। তৎকালীন আইপিজিএমআর হাসপাতালে কিডনি সংযোজনের মাধ্যমে দেশে প্রথম কিডনি সংযোজন শুরু হয়। অস্ত্রোপচারের পর রোগী তিন সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠে। অতঃপর পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে রোগীটি মারা যান। ১৯৮২ সালে আরো একজন রোগীর শরীরে কিডনি সংযোজন করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর ব্যক্তি নয় মাস সুস্থ জীবন যাপন করেন। অতঃপর সীমিত অবকাঠামো, উন্নত ব্যবস্থাপনা ও একটি বিশেষজ্ঞ টিম নিয়ে ১৯৮৮ সাল থেকে প্রতি সপ্তাহ-মাসে একটি করে কিডনি সংযোজন হতে থাকে।[৮]

বাংলাদেশে বর্তমানে জীবিত নিকটাত্মীয়ের মধ্যে কিডনি সংযোজন এবং এর সাফল্যও উন্নত বিশ্বের যে কোন দেশের সমান। জীবিত নিকটাত্মীয় বলতে মা-বাবা, ছেলেমেয়ে ও ভাইবোন বুঝায়। কিডনি দেয়ার আগেই তাদের রক্তের গ্রুপ ও টিস্যু

---

[৮] অধ্যাপক হারুন আর রশিদ, *অঙ্গ সংযোজন ও বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান,* দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ মে, ২০১০, পৃ. ৪

টাইপ পরীক্ষা করা হয়। দাতার সঙ্গে রোগীর রক্ত ও টিস্যুর সাদৃশ্যের পর অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষাও করা হয়। ১৯৮৮ সাল থেকে তৎকালীন পিজি হাসপাতাল বর্তমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে, ২০০৪ সাল থেকে ইব্রাহিম মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হাসপাতালে, ২০০৬ সাল থেকে কিডনি ফাউন্ডেশনে কিডনি সংযোজন শুরু হয়েছে। দুই বছর ধরে কিডনি ইনস্টিটিউট অব ইউরোলজি বা নিকডুতে এবং ইউনাইটেড হাসপাতালে কিডনি সংযোজন শুরু হয়েছে। এসব হাসপাতালে শুধু লাইফ রিলেটেড কিডনি সংযোজিত হয়।

এ পর্যন্ত (জানুয়ারি ২০১০) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬৫টি, কিডনি ফাউন্ডেশনে ১৪৭টি, বারডেম হাসপাতালে ৫০টি, ইউনাইটেড হাসপাতালে [illegible]টি এবং নিকডুতে ১৬টি কিডনি সংযোজিত হয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, কিডনিদাতারা সবাই ভালো আছেন ও সুস্থ জীবন যাপন করছেন। এ ছাড়া কিডনি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মিরপুরে বৃহদাকারে কিডনি ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষে ছয়তলা বিশিষ্ট স্থায়ী ভবন নির্মাণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। এতে কিডনি রোগীদের চিকিৎসার প্রসার ঘটবে বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশে মৃত ব্যক্তি থেকে কিডনি সংযোজনের হার কম। মৃত্যুর পর কিডনি দানে অনাগ্রহ এবং মৃতপ্রায় ব্যক্তির কিডনি নিয়ে অন্য রোগীকে সংযোজন করা খুবই দুঃসাধ্য হেতু বাংলাদেশে কিডনি সংযোজনের প্রক্রিয়ায় ধীরগতি পরিলক্ষিত হয়। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে এর সুব্যবস্থা রয়েছে এবং ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ কিডনি সংযোজন মৃত ব্যক্তির কিডনি নিয়ে করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও কিডনি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শিগগিরই মরণোত্তর কিডনি প্রতিস্থাপন শুরু হবে বলে জানা গেছে।[১]

কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন

কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন ব্যবস্থা আধুনিক প্রযুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ প্রযুক্তিতে মানুষের দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন ধাতব তৈরী কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন করা হয়। কৃত্রিম হাত-পা, দুর্বল হৃৎপিণ্ডে পেস্ ম্যাকার, কানে হিয়ারিং সাপোর্টার ধাতব তৈরী- এসব কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উন্নত বিশ্বের পাশাপাশি বাংলাদেশেও এ সেবা প্রদান করা হয়। সম্প্রতি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'এনেড্রালাইট বাংলাদেশ' উচ্চ প্রযুক্তির কৃত্রিম পা সংযোজন করে কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজনের কাজে বড় ধরনের সফলতা পেয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য এক বড় অর্জন। এ প্রেক্ষাপটে 'এনেড্রালাইট বাংলাদেশ' দেশের অঙ্গ হারানো মানুষের বিদেশ যাওয়ার ঝামেলা থেকে মুক্তি, অঙ্গ হারানো মানুষকে নতুন

---

[১] অধ্যাপক মো. শহীদুল ইসলাম সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

জীবনের আশা ও কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজনের পর সব রোগীকে আজীবন কোন ধরনের ফি ছাড়াই সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।[১০]

লিভার বা যকৃৎ সংযোজন

লিভার বা যকৃতের অসুস্থতা বা অকার্যকারিতা বা ক্ষতিগ্রস্ততা হেতু অত্যন্ত সর্তকতা ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে আরেকটি সুস্থ লিভারের কিছু অংশ নিয়ে প্রতিস্থাপন করাই লিভার সংযোজন চিকিৎসাপদ্ধতি। বর্তমানে এ চিকিৎসা সেবা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠছে যদিও তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। যুক্তরাষ্ট্রের ডা. থমাস স্টাজ্রের নেতৃত্বে একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ১৯৬৩ সালে সর্বপ্রথম মানবদেহে লিভার প্রতিস্থাপন করেন। ডা. স্যার রয় কেন আশির দশকে সাইক্লোসপোরিন ব্যবহার করে এই চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ করেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের শতাধিক কেন্দ্রে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা হচ্ছে। তা ছাড়া ইউরোপসহ বিশ্বের আরো অনেক দেশে লিভার সংযোজন ব্যবস্থা রয়েছে। এ ক্ষেত্রেও দাতার অভাবে চাহিদা শ্রোতাকে সেবা দেয়া কোন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে সম্ভব হচ্ছে না বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত পাওয়া গেছে।[১১]

বাংলাদেশে কিডনির পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের পরবর্তী ধাপ লিভার সংযোজন। দেশে লিভার সমস্যায় আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের লিভার আক্রান্তের মূল কারণ হচ্ছে 'হেপাটাইটিস বি'। এছাড়া 'এ, সি ও ই' ভাইরাস দ্বারা লিভার হেপাটাইটিস হয়ে থাকে। অতি মাত্রায় এ্যালকোহল গ্রহণেও লিভার নষ্ট হতে পারে। জন্ডিস দেখা দিলে এ রোগটি ধরা যায়, যদিও নিশ্চিত হওয়ার জন্য রোগীর রক্তে ভাইরাসের নির্দিষ্ট এন্টিজেন বা এন্টিবডি উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। হেপাটাইটিস জন্ডিস হিসেবে বা জন্ডিস ছাড়াও ধরা পড়তে পারে। হেপাটাইটিস বি দ্বারা আক্রান্ত বেশিরভাগ রোগীর দেহে ভাইরাসটি বাহক হিসেবে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এ সংক্রান্ত রোগের ব্যাপকতা নির্ভর করে জীবাণু শরীরে প্রবেশের সময় এবং ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর। এ রোগের মাত্রা জটিল পর্যায়ে চলে গেলে আক্রান্তের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যায়। তখন অনিবার্যভাবে লিভার সংযোজনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ব্যয়বহুল চিকিৎসা হওয়ার কারণে দরিদ্র রোগীর নিশ্চিত মৃত্যুর প্রহর গোনা ছাড়া উপায় থাকে না। এতে আত্মীয়-স্বজনকে শারীরিক ও মানসিকভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়। তবে এমন পরিস্থিতিতে রাজধানীর বারডেম হাসপাতাল দেশে প্রথমবারের মত সফল লিভার প্রতিস্থাপন সম্পন্ন করে সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। বারডেমের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও ল্যাবএইড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ লিভার সংযোজন শুরুর প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও

---

১০ *সাংবাদিক সামিনের কৃত্রিম পা সংযোজন*, আমার দেশ, ১০ আগস্ট, ২০১০, পৃ. ৭

১১ অধ্যাপক হারুন আর রশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪

যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাপনায় অগ্রসর হয়েছে। এভাবে দেশে একাধিক হাসপাতালে পূর্ণাঙ্গ লিভার সংযোজন কার্যক্রম শুরু হলে রোগীদের বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে না। এর চিকিৎসা ব্যয় বিদেশে সাধারণত পঞ্চাশ লাখ থেকে দেড় কোটি টাকা প্রয়োজন হয় অথচ দেশে ২০ থেকে ২৫ লাখ টাকায় সুচিকিৎসা প্রদান সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তা সম্ভব হলে চিকিৎসা ব্যয় হ্রাসের পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক হয়রানি থেকে রোগীরা পরিত্রাণ পাবে।[১২]

হৃৎপিণ্ড-ফুসফুস সংযোজন

একই ব্যক্তির দেহে হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুস সংযোজন একই সঙ্গে করাকেই 'হার্ট-লাং ট্রান্সপ্লান্টেশন' বলে। রাশিয়ান চিকিৎসক ডেমিকভ ১৯৪০ সালে পরীক্ষামূলকভাবে প্রাণীর দেহে হার্ট-লাং সংযোজনের ব্যবস্থা করেন কিন্তু তিনি সফলতা লাভ করতে পারেননি। ১৯৬৭ সালে ডাক্তার ক্রিস্টিয়ান বার্নার্ড সর্বপ্রথম মানবদেহে হৃৎপিণ্ড সংযোজনে সফলকাম হন। এ চিকিৎসার মাধ্যমে অর্জিত সফলতা শুরুতে যদিও এক বছরের বেশি দীর্ঘায়িত করা যায়নি কিন্তু পরবর্তী সময়ে শতকরা পচাঁত্তর ভাগ রোগীকে তিন বছরের বেশি সময় বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। এখন তা আরো প্রলম্বিত হচ্ছে। এতে অ্যান্টিবায়োটিক ও আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির প্রযুক্তিগত উন্নতি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। তাদের এ প্রচেষ্টাকে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং ভার্জেনিয়া মেডিকেল কলেজ আরো সফলতার দিকে নিয়ে যায়। বর্তমানে হৃৎপিণ্ড সংযোজন বা প্রতিস্থাপন একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল চিকিৎসা। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৬৮ সালে ডেনটন কুলি ও তাঁর দল প্রথম দুই মাস বয়সী একজন মানব শিশুর জন্মগত ত্রুটিযুক্ত হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস সংযোজনের চেষ্টা করেন। একে মূলধন করে পরবর্তী সময়ে সত্তরের দশকেই মানবদেহে হার্ট-লাং ট্রান্সপ্ল্যান্ট শুরু হয়। ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব হার্ট-লাং ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ১৯৮২-২০০৭ এর মধ্যে ২৫০০ রোগীর চিকিৎসা রিপোর্ট পায় এবং বর্তমানে সোসাইটি প্রতি বছর ৫০-১৫০ ট্রান্সপ্ল্যান্ট কেস রিপোর্ট করেছে। তবে এর ব্যয় এত বেশি যে, তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে এমনকি তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতিও বটে।[১৩]

ইসলামের দৃষ্টিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান ও সংযোজন

বিশ্বমানবতার জন্য ইসলাম আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বিধান। ইসলাম জীবন ও ভাবনার প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিধান দিয়েছে। ইসলাম বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি এবং

---

১২ *বারডেমে সফল চিকিৎসা : লিভার সংযোজন দেশেই সম্ভব*, দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ জুলাই, ২০১০, পৃ. ২১

১৩ অধ্যাপক হারুন আর রশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪

প্রগতিকে সাহসিকতার সাথে স্বাগত জানায়। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ মানবকল্যাণধর্মী কোন কাজকে বাধাগ্রস্ত করে না; বরং নিরন্তর উৎসাহিত করে। তবে এ সবের নৈতিক ও মানবিক দিকগুলো খুব গভীর শুদ্ধতায় বিবেচনা করে।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যেমনি সমসাময়িক যুগে বিদ্যমান বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে তেমনি ভবিষ্যত সমস্যার সমাধানের জন্য কিছু কিছু সূত্রও ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সবর্দা যে কোন বিষয়ের সময়োপযোগী সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায়। ইসলাম এর আলোকেই নতুন যুগের তথা অনাগত দিনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সক্ষম হয়। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা বিশেষত চিকিৎসা শাস্ত্রেও ইসলাম যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত প্রদানে সফলতা প্রদর্শন করেছে।

ইসলাম চিকিৎসা সেবা প্রদানকে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও নৈতিক দায়িত্ব মনে করে। রসূলুল্লাহ স. আর্ত-পীড়িতদের সেবা-যত্নের ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ রাখতেন। তিনি পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব কিংবা প্রিয়জনদের অসুস্থতার সংবাদ পেলে সেবার জন্য হাজির হতেন। এমনকি কোন ইহুদি অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা করতেন।[১৪] রসূলুল্লাহ স. বলেন, "যে ব্যক্তি কোন পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে বা সেবা করতে যায়, আকাশ থেকে একজন ঘোষণাকারী তাকে সম্বোধন করে বলে, "তুমি আল্লাহ তাআলার জন্য অত্যন্ত খুশির কাজ করেছ; তোমার এ পদক্ষেপ প্রভূত কল্যাণদায়ক হয়েছে এবং এ কাজের মাধ্যমে তুমি জান্নাতে বাসস্থান সংগ্রহ করেছ।"[১৫] তিনি আরো বলেন, "তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর, পীড়িতের সেবা কর এবং কয়েদির মুক্তির ব্যবস্থা কর"।[১৬] "যে ব্যক্তি অজু করে নেকী লাভের উদ্দেশ্যে তার কোন

---

১৪ ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায়: আল-মারদা, অনুচ্ছেদ: ইয়াদাতুল-মুশরিক, বৈরুত: দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭, পৃ. ১২১৭

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ غُلَامًا لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم يَعُودُهُ، فَقَالَ: أَسْلِمْ " فَأَسْلَمَ

১৫ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়: আল-বিরর ওয়াস-সিলাহ ওয়াল-আদাব, অনুচ্ছেদ: ফাযলু ইয়াদাতিল-মারিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬৪

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : " عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ "

১৬ ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায়: আল-মারদা, অনুচ্ছেদ: ওযূবু ইয়াদাতিল-মারিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫২

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : " أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ "

পীড়িত মুসলমান ভাইকে দেখতে বা সেবা করতে যায়, সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন হতে সত্তর বছরের দূরত্বে অবস্থান করে।"[১৭] রসূলুল্লাহ স. বলেন, তামার বালতি হতে অন্যের বালতিতে পানি ঢেলে দেয়া সাদাকা কাউকে কোন ভাল কাজের আদেশ করা একটি সাদাকা, মন্দ কাজে নিষেধ করা সাদাকা। পথে-প্রান্তরে পথহারা মানুষকে পথের সন্ধান দেয়া সাদাকা; অন্ধকে পথ চলতে সাহায্য করা সাদাকা; "তোমাদের ভাইয়ের দিকে হাসি মুখে তাকানো তোমাদের জন্য একটি সাদাকা বা পুণ্যের কাজ; মানুষের চলার পথ থেকে কাটা-পাথর ইত্যাদি কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা সাদাকা।"[১৮] রসূলুল্লাহ স. অসুস্থ রোগীর সেবা প্রদানকে আল্লাহ তাআলার সেবা প্রদান বলে আখ্যা দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ র. বলেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ বনী আদমকে লক্ষ করে বলবেন, আমি অসুস্থ ছিলাম কিন্তু তুমি আমার সেবা করনি। আদম সন্তান বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক, কাজেই আমি কিভাবে তোমার সেবা করবো? তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দাহ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল অথচ তুমি তার সেবা করনি? তুমি যদি তার সেবা করতে তবে আমাকে তোমার কাছে পেতে। হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক, আমি কিভাবে তোমাকে আহার করাবো? তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দাহ তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল অথচ তুমি তাকে খাবার দাওনি। তুমি যদি তাকে খাবার দিতে তবে আমাকে তোমার কাছে পেতে।

হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে পানীয় চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। বান্দা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক! কাজেই আমি কি ভাবে তোমাকে পানি পান করাবো? তিনি বলবেন, আমার এক বান্দাহ তোমার কাছে পানি চেয়েছিল অথচ তুমি তাকে পানি দাওনি। তুমি যদি তাকে

---

১৭ ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-জানায়িয, অনুচ্ছেদ: ফি ফাযলি আলাল-ওযূ, সিরিয়া: দারুল-ফিকর, তা. বি., পৃ. ৮৫৯

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا، بُوعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيفًا ".

১৮ ইমাম বুখারী, *আল-আদব আল-মুফরাদ*, বৈরূত: দারুল-বাসাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৯, পৃ. ২২৭

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، يَرْفَعُهُ قَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لا أَعْلَمُهُ إِلا رَفَعَهُ، قَالَ: " إِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَهِدَايَتُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّالَّةِ صَدَقَةٌ "

পানি পান করাতে তবে আমাকে তোমার কাছে পেতে।[১৯] রোগী দেখতে গেলে তিনি সান্ত্বনা দিতেন ও মনে সাহস যোগাতেন। তিনি নিজেও জনগণকে বিভিন্ন সহজলভ্য ঔষধ সম্পর্কে অবহিত করতেন। রসূলুল্লাহ স. বলেন, "কোন মুসলিম যখন কোন রোগে আক্রান্ত হয় কিংবা কোন কষ্ট-ক্লেশে পড়ে, তখন তার পাপরাশি এভাবে ঝরে যায় যেমন শীত ঋতুতে বৃক্ষপত্র ঝরে যায়।"[২০]

আকীদাগত বিশুদ্ধতার অপরিহার্যতা

মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনসহ সর্বপ্রকার রোগের চিকিৎসার পূর্বে প্রত্যেক মুসলিমের নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস থাকতে হবে-

এক. রোগ মুমিনের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের বিভিন্ন প্রকার রোগের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি তোমাদেরকে ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, জান-মাল ও ফসলের স্বল্পতা দ্বারা পরীক্ষা করব। তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।"[২১] উক্ত আয়াতে বর্ণিত জান-মালের স্বল্পতা দ্বারা মৃত্যু ও রোগ এ দুটি বিষয় উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা আইয়ুব আ. কে রোগ দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের সূরা আম্বিয়ায় এ সম্পর্কিত আলোচনা বিদ্যমান।[২২]

---

১৯ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়: আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ: ফাযলু ইয়াদাত আল-মারিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و سلم : " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ يَا رَبِّ: كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ يَا رَبِّ: وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ؟ فَلَمْ تُطْعِمْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ يَا رَبِّ: كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ "

২০ ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায়: আল-মারদা, অনুচ্ছেদ: শিদ্দাতুল-মারদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১৪

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا

২১ আল-কুরআন, ২:১৫৫ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

২২ আল-কুরআন, ২১:৮৩-৮৪ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

দুই. প্রত্যেক রোগ এক প্রকার কল্যাণের বাহক। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার চিরন্তন নীতি হলঃ "নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে, নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে।"[২৩]

তিন. কোন ব্যাধিই দূরারোগ্য নয়; প্রত্যেক রোগেরই চিকিৎসা রয়েছে। রোগ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসে আর তিনিই রোগ মুক্তির ঔষধ প্রদান করেন। পৃথিবীতে বিদ্যমান সর্বপ্রকার রোগের ঔষধ আল্লাহ তাআলা প্রকৃতিতে নিহিত রেখেছেন। নবী স. বলেন, "আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার প্রতিষেধক পাঠাননি।"[২৪] তোমরা গোদুগ্ধ পান কর, কেননা তাতে সর্বপ্রকার গাছের নির্যাস মিশ্রিত হয়।"[২৫] তিনি আরো বলেন, "প্রত্যেক রোগের ঔষধ রয়েছে। যখন রোগ অনুযায়ী যথাযথ ঔষধ প্রয়োগ হয় তখন আল্লাহর হুকুমে রোগ মুক্ত হয়।"[২৬] উমামা ইবনে শারীক রা. বলেন, "কিছু বেদুঈন এসে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা চিকিৎসা গ্রহণ না করলে কি আমাদের গুনাহ হবে? তিনি উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর। মহান আল্লাহ একটি মাত্র ব্যাধি ছাড়া এমন কোন ব্যাধি সৃষ্টি করেননি যার প্রতিষেধক সৃষ্টি করেননি এবং যা দূরারোগ্য। তারা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! দূরারোগ্য সে ব্যাধিটি কি? রসূলুল্লাহ স. উত্তরে বললেন, সেটি হল বার্ধক্য।"[২৭]

---

[২২] فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ

[২৩] আল-কুরআন, ৯৪:৫-৬ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

[২৪] আল-হুসাইন ইবনি মাসঊদ আল-বাগাভী, *শারহুস-সুন্নাহ,* বৈরূতঃ আল-মাকতাবা আল-ইসলামী, তা. বি., পৃ. ১৬৮৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ: "مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً"

[২৫] ইমাম নাসাঈ, *আস-সুনান আল-কুবরা,* বৈরূতঃ দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯১, পৃ. ১৭২০

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً، إِلا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، وَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ ؛ فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ "

[২৬] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায়ঃ আস-সালাম, অনুচ্ছেদঃ লি কুল্লি দাইন দাওয়াউন ওয়া ইসতিহবাবুত-তাদাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫৩৬

عَنْ جَابِرٍ، عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أَنَّهُ قَالَ:لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ

[২৭] ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, *আল-জামি',* অধ্যায়ঃ আল-তিব্ব, অনুচ্ছেদঃ মা যাআ ফি আত-দাওয়া ওয়াল হাসসি আলাইহি, বৈরূতঃ দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, তা. বি., হাদীস নং ২০৩৮, পৃ. ৩৮৩

চার. ঔষধ রোগ মুক্তির 'উসীলা' মাত্র। তাই ঔষধ দ্বারা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় না। ঔষধের নিজস্ব কোন রোগ নিরাময় শক্তি নেই। বরং তা আল্লাহর হুকুমেই ফল প্রদান করে। তাই ঔষধ রোগ নিরাময়ের একটি মাধ্যম মাত্র। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে হযরত ইবরাহীম আ.-এর উক্তি নিজের বর্ণনায় এ ভাবে বলেন, "আমি যখন অসুস্থ হই তখন তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।"[২৮]

পাঁচ. ব্যক্তির অসুস্থতার পর যথাযথ চিকিৎসা পেলে সে সম্পূর্ণ সুস্থ সতেজ হয়ে ওঠতে পারে। রসূলুল্লাহ স. বলেন, "যখন কোন মানুষ রোগে পতিত হয় তখন আল্লাহ তাআলা তার কাছে দু'জন ফিরিশতাকে এ নির্দেশ সহকারে পাঠান যে, অসুস্থ ব্যক্তি তার সেবাকারীর সাথে কি বলছে, যদি ঐ ব্যক্তি অসুস্থ হওয়ার পরেও আল্লাহ তাআলার শুকর করতে থাকে তবে সে খবর ফিরিশতাদ্বয় আল্লাহ তাআলার কাছে নিয়ে যায় অথচ তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিক জ্ঞাত। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি যদি তাকে মৃত্যু দেই তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব আর যদি তাকে রোগ থেকে মুক্তি দেই তবে তার খারাপ গোশতকে ভাল গোশত দ্বারা এবং দুষিত রক্তকে উত্তম রক্ত দ্বারা বদলে দেব এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দেব।"[২৯]

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন বিষয়ে শরয়ী বিধান

কোন অঙ্গ স্থায়ীভাবে অকেজো বা অকার্যকর হলে বা সম্ভাবনা দেখা দিলে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের নির্দেশনা প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে শরয়ী আইনের প্রাথমিক উৎস পবিত্র কুরআন বা হাদীসে সরাসরি কিছু পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ। কারণ সে যুগে এ সব

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: قَالَتْ الْأَعْرَابُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: " نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ قَالَ: دَوَاءً، إِلَّا دَاءً وَاحِدًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ "

২৮ আল-কুরআন, ২৬ : ৮০ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

২৯ ইমাম মালিক, *আল-মুয়াত্তা,* অধ্যায়: আল-আইন, অনুচ্ছেদ: মা জাআ ফি আযরিল-মারিদ, আল-কাহেরা: দারুল-ফজর লিত-তুরাস, ২০০৫, পৃ. ৬২১

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سلم قَالَ: إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ، فَقَالَ: " انْظُرَا مَاذَا يَقُولُ لِعُوَّادِهِ؟ " فَإِنْ هُوَ إِذَا جَاءُوهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ أَعْلَمُ، فَيَقُولُ: " لِعَبْدِي عَلَيَّ إِنْ تَوَفَّيْتُهُ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ أَنْ أُبْدِلَ لَهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ

প্রযুক্তির প্রয়োগ হয়নি। এক্ষেত্রে শরীয়ার মূল লক্ষ (মাকাসিদ আল-শরীয়াহ) এবং ফিকহ নির্ধারিত কর্মকৌশল (কাওয়ায়িদ আশ-শরীয়া) এর সাহায্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। ইসলামী শরীয়ার প্রধান লক্ষ হল 'হিফজ আন-নাফ্স' বা জীবন রক্ষা করা যা চিকিৎসা বিদ্যার প্রাথমিক এবং মৌলিক উদ্দেশ্য। চিকিৎসা ব্যবস্থা মানুষের মৃত্যুকে রুখতে বা স্থগিত রাখতে পারে না। চিকিৎসা কেবল আল্লাহ নির্ধারিত মৃত্যুর সময় আসা পর্যন্ত মানুষের জীবনকে আরামদায়ক, ব্যথামুক্ত ও সচল রাখতে সাহায্য করে। চিকিৎসা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সক্রিয় রাখে। যেসব রোগ মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে চিকিৎসা বিজ্ঞান সেসব রোগের উপশম ও প্রতিরোধের উপায় বলেছেন। কাজেই শরীয়ার লক্ষের সাথে চিকিৎসাবিদ্যার সম্পর্ক রয়েছে।[৩০] অঙ্গ প্রতিস্থাপন বিষয়ে শরীয়ার আলোকে অঙ্গদাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের জীবন বা জীবনের মান নিশ্চিত করতে আদেশ প্রদান করেছে। কোন জীবিত ব্যক্তির দানকৃত অঙ্গ বা কোন মৃত ব্যক্তির সচল অঙ্গ নিয়ে প্রতিস্থাপন করাকে 'ক্বাওয়ায়িদ আল-শরীয়ায়' বর্ণিত 'জারুরাত' অবস্থায় মৃত মানুষের গোশত খাওয়ার অনুমোদনের সাথে তুলনা করা যায়। তবে জীবিত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানের ক্ষেত্রে গ্রহীতার সুবিধার চাইতে দাতার সুস্থতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। জরুরী পরিস্থিতি মোকাবিলার বিধান স্বাভাবিক অবস্থায় নিষিদ্ধ বা নিরুৎসাহিতকৃত পদ্ধতিকেও অনুমোদন করে। গ্রহীতার দেহে কোন অঙ্গ স্থাপনের পূর্বে অন্যের অঙ্গ নেয়ার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া এবং এর ঝুঁকি বিবেচনা করতে হবে। শুধু হ্রাস পাওয়া কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অথবা যা শরীরের সুস্থতার জন্য অত্যাবশ্যক নয় এমন অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যয়বহুল এ সার্জারী প্রয়োগ না করা ভাল হবে। ইসলামী শরীয়ার বর্ণিত জরুরী অবস্থা এবং জারুরাত এ দুটোকে সামনে রেখে প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, জটিলতা, ইনফেকশন, গ্রাফ্ট প্রত্যাখ্যান, ড্রাগ টক্সিসিটি এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে কোন হালাল প্রাণীর অঙ্গ ব্যবহার, কৃত্রিম অঙ্গ ব্যবহার, নিজের অঙ্গ প্রতিস্থাপন এবং সুস্থ বা জীবিত ও উপযুক্ত নিকটাত্মীয় বা বন্ধু বা দাতার দান গ্রহণকে সম্মতি দেয়া যায়। স্বেচ্ছায় কোন বাবা বা মা তার আগুনে পোড়া শিশুর জন্য চামড়া দান করলে ইসলাম তা নিষেধ করে না।[৩১]

অঙ্গদান ও প্রতিস্থাপনের নৈতিক দিক

ইসলাম মানব জীবনকে সর্বপ্রকার কষ্ট, গ্লানি ও জটিলতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। পবিত্র কুরআন মানব জীবনে শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিধানে ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও জাতি ইত্যাদি বৈষম্যের উর্ধ্বে ওঠে সব মানুষের জীবন রক্ষাকে এক পবিত্র আমানত

---

[৩০] প্রফেসর ড. ওমর হাসান কাসুলী, *মেডিকেল এথিক্স: ইসলামী দৃষ্টিকোণ,* অনু: ড. শারমিন ইসলাম, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১০, পৃ. ৮

[৩১] *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৪-৩৬

হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন লোককে হত্যা করে, যে লোক কাউকে হত্যার অপরাধে অপরাধী নয়, কিংবা পৃথিবীতে বিপর্যয়ও সৃষ্টি করেনি; সে যেন পুরো মানব জাতিকেই হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচিয়ে রাখে সে যেন পুরো মানব জাতিকে বাঁচাল।"[৩২] পবিত্র কুরআন এ আয়াতে একজন মানুষের অন্যায় হত্যাকে পুরো মানব জাতির হত্যা বলে উল্লেখ করেছে। আবার একজন মানুষের জীবন রক্ষাকে পুরো মানবজাতির জীবন রক্ষার সমকক্ষ বলে ঘোষণা করেছে। অন্য কথায় কোন মানুষ যদি মানুষের জীবন রক্ষার জন্য চেষ্টা করে তাহলে সে পুরো মানব জাতিকে জীবিত রাখার কাজ করে। এ ধরনের প্রচেষ্টা এতো বড় কল্যাণের কাজ যে, এটাকে পুরো মানবতাকে জীবিত করার সমান গণ্য করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে মুসলিম ভাইদের মাঝে ভালো ও ন্যায়ের কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা করা এবং অন্যায় ও জুলুমের কাজে কারো সাথে সহযোগিতা না করাকে অন্যতম একটি মূলনীতি ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "কল্যাণমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং পাপ কাজে সহযোগিতা করো না।"[৩৩] ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্কের আদান-প্রদান, আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। রসূলুল্লাহ স. বলেন, "তোমরা পরস্পর মুসাফাহা কর, বিদ্বেষ লোপ পাবে। একে অপরকে উপহার-উপঢৌকন প্রদান কর, ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং ঘৃণা দূরীভূত হবে।"[৩৪] রসূলুল্লাহ স. বলেন, "সে সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ ! "তোমরা ঈমান গ্রহণ ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। পারস্পরিক হৃদ্যতা ব্যতীত তোমাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ হবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছুর সন্ধান দেব না, যা পালন করলে তোমরা একে অপরের হৃদ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ হবে? তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের প্রচলন

---

৩২ আল-কুরআন, ৫:৩২ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

৩৩ আল-কুরআন, ৫:২ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

৩৪ ইমাম মালিক, *আল-মুয়াত্তা*, অধ্যায়: হুসন আল-খুলক, অনুচ্ছেদ: মা জাআ ফিল-মুহাযারাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০৩
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : " تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ"

ঘটাও"।[৩৫] আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছেন তাই এ ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্ক রক্ষা করা আবশ্যক। আর ভ্রাতৃত্বের এ সম্পর্ক বিভিন্নভাবে রক্ষা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জীবন-সম্পদ বা কথা দিয়ে মুসলিমের জীবনে পারস্পরিক সাহায্য করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর যদি তারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট কোন সহযোগিতা চায়, তাহলে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তবে এমন কওমের বিরুদ্ধে নয়, যাদের সাথে তোমাদের একে অপরের চুক্তি রয়েছে এবং তোমরা যে আমল কর, সে ব্যাপারে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিমান।"[৩৬]

পারস্পরিক সহমর্মিতা তথা অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া এবং তার আনন্দে আনন্দিত হওয়ার মাধ্যমেও সাহায্য-সহযোগিতা করা যায়। রসূলুল্লাহ স. বলেন, "ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে মুমিনরা একই দেহের মতো। এ দেহের একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে অন্য অঙ্গসমূহ এর জন্য ব্যথিত হয়, জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে ও বিনিদ্র রজনী কাটায়।"[৩৭] মুসলিমদের পারস্পরিক ভালোবাসা প্রকাশের একটি মাধ্যম হল, পারস্পরিক অধিকারের প্রতি সচেতন থাকা এবং কোন মুসলিম অসুস্থ হলে যথাসম্ভব তার সেবা করা। ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমকে তার সমাজের ব্যক্তিবর্গের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেন।"[৩৮] ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও পরোপকার আল্লাহ তাআলার সঙ্গে বান্দার লোকসানের

---

[৩৫] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়: আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ: বায়ানু আন্নাহু লা ইয়াদখুলুল-জান্নাতা ইল্লাল-মুমিনুনা ওয়া আন্না মাহাব্বাতাল-মুমিনিনা মিনাল-ঈমান ওয়া আন্না ইফসাউল-সালামি সাবাবান লি হুসূলিহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم: " لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا، أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ".

[৩৬] আল-কুরআন, ৮:৭২

وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

[৩৭] ইমাম আবূ হানীফা, *আল-মুসনাদ*, রিয়াদ: মাকতাবাতু আল-কাওসার, ১৯৯৪, পৃ. ১০৩

عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم يَقُولُ: " مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثَلُ جَسَدٍ وَاحِدٍ، إِذَا اشْتَكَى الرَّأْسُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُهُ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى "

[৩৮] আল-কুরআন, ১৬:৯০

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

আশঙ্কাহীন একটি ব্যবসায়িক সম্পর্ক। মহান আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারা এমন ব্যবসা বা কল্যাণের আশা করে, যাতে কখনও ক্ষতি হবে না।"[৩৯] পরোপকার দ্বারা সহজেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। রসূলুল্লাহ স. বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে সদয় ব্যবহার ও দয়া করে না, আল্লাহ তাআল্যাও তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার এবং দয়া দেখাবেন না।"[৪০] তিনি আরো বলেন, "এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, সে তার ওপর জুলুম করবে না এবং তাকে ধ্বংসের দিকে ফেলে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের বিপদে সাহায্য করবে, আল্লাহ তাআলা তার বিপদে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমদের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার বিপদগুলোর কোন একটি বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন"।[৪১]

আল্লাহ তাআলার রাস্তায় অর্থ-সম্পদ দান করার জন্য বারবার সাধারণ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে কোন কাজের নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে তার অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতাও স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমাদের প্রিয় জিনিসগুলো আল্লাহর পথে খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই পুণ্যশীলতার উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারে না।"[৪২]

---

[৩৯] আল-কুরআন, ৩৫:২৯

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

[৪০] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, আল-*মুসনাদ*, বৈরূত: দারু এহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, তা. বি., পৃ. ৪৭৫৮

عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم يَقُولُ: "مَنْ لَمْ يَرْحَمْ النَّاسَ لَمْ يَرْحَمْهُ اللَّهُ

[৪১] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায়: আল-মাযালিম, অনুচ্ছেদ: লা ইয়াযলিমু আল-মুসলিমু আল-মুসলিমা ওয়ালা ইয়ুসলিমুহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৫

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

[৪২] আল-কুরআন, ৩:৯২ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

আল্লাহর রাস্তায় অর্থব্যয়ের তুলনায় কোন মানুষ তার শরীরের কোন অঙ্গ অতীব প্রয়োজীনয় মুহূর্তে দান করা আরো বেশি কঠিন ত্যাগের বিষয়। কোন মানুষের উপকারে এরূপ সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান অতি উচ্চ দয়া ও অনুকম্পার দৃষ্টান্ত। রসূলুল্লাহ্ স. কঠিন মুহূর্তে জীবন রক্ষার কাজে এগিয়ে আসাকে আল্লাহর নিকট অতীব সওয়াবের কর্ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি একটি ইতর প্রাণীর জীবন রক্ষাকেও মহাপুণ্যের কাজ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। একজন মহিলা বেশ কষ্ট করে কূপ থেকে পানি উঠিয়ে একটি পিপাসার্ত কুকুরের তৃষ্ণা নিবারণে সাহায্য করল। এই ক্ষুদ্র একটি অমুকম্পা প্রদর্শনের জন্যই মহিলাটি দোজখে যাওয়া থেকে রক্ষা পেল।[৪৩]

একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানো কোন অসাধারণ ঘটনা নয় অথচ হাদীসে বর্ণিত ঘটনা থেকে অনুধাবন করা যায় যে, এই ছোট্ট সৎকর্মটির প্রকৃত মূল্য বিশাল। যা এমনকি একজন পাপিষ্ঠ রমণীর সব অপরাধকে নিঃশেষে মুছে দিয়েছে। ইসলাম কোন বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। ভবিষ্যতের অপ্রত্যাশিত ক্ষতি, লোকসান কিংবা দুর্দশার বিপরীতে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ গঠন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের পূর্বশর্ত করা হয়েছে। ইসলাম কারো জীবনহানির মাধ্যমে ঐ পরিবারের সন্তানেরা এতিম ও স্ত্রীর বিধবা হওয়ার পূর্বে ব্যক্তির চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অনুমোদন করে। এক্ষেত্রে নিকটাত্মীয়দের ভূমিকা ও দায়িত্ব অনেক বেশি। রসূলুল্লাহ স. ঘোষণা করেন, "যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কারো উপর আসে সে যদি তা সঠিকভাবে পালন না করে তাদের ধ্বংস করে, তাহলে এতেই তার বড় গুনাহ হবে।"[৪৪] তিনি আরো বলেন, "যাদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব একজনের হাতে, সে যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে এ কাজ তার গুনাহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"[৪৫]

---

[৪৩] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায়: আহাদিসুল-আম্বিয়া, অনুচ্ছেদ: (সর্বশেষ সংযোজনী), *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১০৩৬

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم: " بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ

[৪৪] ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* সিরিয়া: দারুল-ফিকর, তা. বি. পৃ. ৪৬৫

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

[৪৫] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায়: আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ: ফাযলুন নাফকাতি আলাল ইয়াল ওয়াল মামলুক ওয়া ইসমি মান দাইয়্যাহুম ওয়া হাবসু নাফকাতিহিম আনহুম, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬২৯

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ "

সুতরাং এরূপ রোগাক্রান্ত রোগীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের দায়িত্ব। এ ছাড়া ইসলামে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীকে দান করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।"[৪৬] তিনি অন্যত্র বলেন, "আত্মীয়রাই আল্লাহর বিধানে একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার।"[৪৭]

পবিত্র কুরআনে আত্মীয়-স্বজনকে 'যুল-আরহাম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'আরহাম' শব্দটি 'রহম' শব্দের বহুবচন। 'রহম' শব্দটি আল্লাহ তাআলার অন্যতম গুণবাচক নাম আর-রহমানের সাথে সংশ্লিষ্ট। সাধারণ অর্থে রক্ত সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গকেই আত্মীয়-স্বজন বলা হয়। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি এবং স্বামী -স্ত্রীর পরেই এ রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের অধিকার। তাকে 'সিলাতুর রিহম' বলা হয়। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল স. আত্মীয়-স্বজনের অধিকার পালনে বারবার তাগিদ দিয়েছেন। একটি হাদীসে এসেছে, "আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আল্লাহ এবং রহমান। আমি আত্মীয়তা সৃষ্টি করেছি এবং আমার নামে এর নামকরণ করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি এটি রক্ষা করে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করি, যে ব্যক্তি এটি ছিন্ন করে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।"[৪৮] উক্ত হাদীসের মর্ম চিকিৎসাবিজ্ঞান দিয়ে কিছুটা উপলব্ধি হয়। কোন ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার নিকট আত্মীয়ের পাওয়া গেলে প্রতিস্থাপনে সর্বাধিক সফলতা ও যথাযথ চিকিৎসা সম্ভব হয়। ফলে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও কর্তব্য পালনে তাদের প্রতি করুণা নয়, বরং এটা তাদের আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত রক্তের সাথে সম্পর্কিত অধিকার বটে। কেউ বিপদে-আপদে পড়লে তাকে বিপদমুক্ত করতে হবে। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রয়োজন অনুযায়ী তার সেবা-যত্ন এবং ওষুধ ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। সব সময় তাদের দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

---

৪৬ আল-কুরআন, ৪ : ৩৬

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

৪৭ আল-কুরআন, ৮ : ৭৫ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

৪৮ ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-বিরর ওয়াস-সিলাহ আর-রসূলিল্লাহ স., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৯

قَالَ اللَّهُ: " أَنَا اللَّهُ، وَأَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ "

কুরআন ও হাদীসে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভূমিকা সম্পর্কে ইঙ্গিত

মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বতন্ত্র ভূমিকা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে মানবদেহের গঠন ও বিকাশের বিভিন্ন স্তর বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এসব ধারাবাহিক বিকাশের মাঝে মানব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পারস্পরিক সম্পৃক্তি যেমন বুঝা যায় তেমনি প্রত্যেকটি অঙ্গের স্বাতন্ত্রিক ভূমিকাও প্রতিভাত হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বর্তমানে তা আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে।

মানুষের কৃতকর্মের যে চিত্র আখিরাতে প্রদর্শিত হবে তার স্বপক্ষে যে সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হবে তা শুধু মানুষই হবে না বরং ফিরিশ্‌তা, জ্বিন, অন্যান্য প্রাণীসমূহ ও মানুষের নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সাক্ষী হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আজ আমি এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং এদের পা সাক্ষ্য দেবে এরা পৃথিবীতে কি উপার্জন করে এসেছে।"[৪৯] আল্লাহর আদেশে বিচারের দিন চোখ, কান, কণ্ঠ ও দেহের চামড়াও ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। মহান আল্লাহ বলেন, দিন তাদের নিজেদের কণ্ঠ এবং তাদের হাত-পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।[৫০] আল্লাহ তাআলা বলেন, "পরে যখন সবাই সেখানে পৌঁছে যাবে তখন তাদের কান, চোখ এবং দেহের চামড়া তারা পৃথিবীতে কি করতো সে সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের শরীরের চামড়াসমূহকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন ? তারা জবাব দেবে, সেই আল্লাহ তাআলাই আমাদের বাকশক্তি দান করেছেন যিনি প্রতিটি বস্তুকে বাকশক্তি দান করেছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর এখন তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"[৫১] রসূলুল্লাহ স. বলেন, "লোকে কিয়ামতের দিন বলবে, আমি আমার হিসাব নিকাশের ব্যাপারে অন্য কারো সাক্ষ্যে সন্তুষ্ট নই। আমার অস্তিত্বের মধ্য থেকেই কোন সাক্ষী না দাঁড়ালে আমি সন্তুষ্ট হব না। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি নিজেই তোমার হিসাব করে নাও। কিরামুন কাতিবীন উপস্থিত থাকবে। তারপর তার মুখে মোহর এঁটে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা তার ক্রিয়া-কর্ম বর্ণনা কর। এতে প্রত্যেক অঙ্গ কথা বলতে শুরু করবে এবং সত্য সাক্ষ্য

---

[৪৯] আল কুরআন, ৩৬:৬৫ اليَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

[৫০] আল কুরআন, ২৪:২৪-২৫ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

[৫১] আল কুরআন, ৪১:২০-২১

حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ- وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

দিবে"।[৫২] উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পার্থিব ও আখিরাতের স্বাতন্ত্রিক ভূমিকা সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায়।

আখিরাত শুধু আত্মিক জগত হবে না। বরং মানুষকে সেখানে দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে পুনরায় ঠিক তেমনি জীবিত করা হবে যেমনটি বর্তমানে তারা এই পৃথিবীতে জীবিত রয়েছে। এক্ষেত্রে পৃথিবীতে কোন মানুষের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোন যৌক্তিক বা অযৌক্তিক কোনরূপ অঙ্গহানি বা দেহহানি ঘটলেও আল্লাহ তাআলা আখিরাতে তাকে পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন। এ পৃথিবীতে যেসব উপাদান এবং অণু-পরমাণুর সমন্বয়ে তার দেহ গঠিত, কিয়ামতের দিন সেগুলোই একত্র করা হবে এবং যে দেহে অবস্থান করে সে পৃথিবীতে কাজ করেছিল পূর্বের সেই দেহ দিয়েই তাকে উঠান হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্য অধিক সহজ।"[৫৩] "যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব।"[৫৪] "নিশ্চয় আকাশ-জমিনের সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির চেয়ে অনেক বড়।"[৫৫] "তারা কি জানে না যে, তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি-বোধ করেন নি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয় তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[৫৬] "যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, তিনি মহানস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলেন, হও তখনই তা হয়ে যায়।"[৫৭]

---

৫২ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়ঃ আল-ফিতান ওয়া আশরাতুস সাআ, অনুচ্ছেদঃ মা বায়নান-নাফখাতাইন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯৯

قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي، قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا، قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ انْطِقِي، قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ

৫৩ আল-কুরআন, ৩০:২৭ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

৫৪ আল-কুরআন, ২১:১০৪ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ

৫৫ আল-কুরআন, ৪০:৫৭ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

৫৬ আল-কুরআন, ৪৬:৩৩

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

৫৭ আল-কুরআন, ৩৬:৮১-৮২

সূরা বাকারাতে এরূপ পাঁচটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, "তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল, যা ছিল শুন্য, সে বলল, কেমন করে আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে একশ বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন। তারপর তিনি তাকে উঠালেন। তিনি বললেন, কতকাল এভাবে ছিলে? সে বলল, আমি একদিন কিংবা একদিনের কিছু সময় ছিলাম। তিনি বললেন, তা নয়, বরং তুমি তো একশ বছর ছিলে। এবার নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে চেয়ে দেখ। সেগুলো পঁচে যায়নি এবং নিজের গাধাটির দিকে চেয়ে দেখ। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর গোশতের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হল, তখন বলে উঠল আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।"[৫৮]

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন সম্পর্কিত অভিমত

ইসলামী জীবন-বিধানে মানুষের সুখ-শান্তি ও কল্যাণ লাভে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যেমনিভাবে সৃষ্টিতে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন, তেমনি মানব জীবন পরিচালনায় প্রদত্ত বিধি ব্যবস্থায়ও ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। তাই ইসলামের শিক্ষা ও দিকনির্দেশনাগুলোও ভারসাম্যমূলক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে ইসলামে বিবেক ও যুক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে সর্ববিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি, যাতে তোমরা মানবমন্ডলীর জন্য সাক্ষী হও এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়"।[৫৯] রসূলুল্লাহ স. বিভিন্ন সময় মুসলমানদেরকে কথা, কাজ ও আচরণে মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ইসলামী শরীয়ায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ - إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون

[৫৮] আল-কুরআন, ২:২৫৯

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

[৫৯] আল-কুরআন, ২:১৪৩

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

সংযোজন একটি মধ্যপন্থী বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিধান, যা ক্ষেত্রবিশেষে অবশ্যই পালনীয় হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নিম্নে এ কয়েকটি ক্ষেত্র আলোচিত হল-

তাবদীল-তাগায়্যুর (পরিবর্তন)

ইসলাম সৃষ্টির মৌলকত্বার মাঝে কোনরূপ পরিবর্তনকে স্বীকৃতি প্রদান করে না। পবিত্র কুরআন এ কাজকে শয়তানের পরামর্শ বলে অভিহিত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হল।"[৬০] ইসলাম মানবদেহের কোনরূপ বিকৃতি ঘটানোকে অমানবিক ও গর্হিত কর্মরূপে চিহ্নিত করেছে। রসূলুল্লাহ স. মুসলিমদেরকে যুদ্ধকালীন সীমালংঘন, অসদাচরণ, লুটতরাজ, মহিলাদের ইজ্জত-সম্ভ্রম নষ্ট করা, অহেতুক কোন কষ্ট দেয়া ও আহতদের অঙ্গচ্ছেদ ঘটানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেছেন। রসূলুল্লাহ স. জিহাদে সেনাপতি নিযুক্ত করে তাকওয়া অবলম্বন, সদ্ব্যবহার, খেয়ানত না করা, ধোঁকা না দেয়া, অঙ্গচ্ছেদন না করা, শিশু হত্যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করতেন।[৬১] রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমরা লড়াইকালীন শত্রুর মুখের উপর আঘাত করবে না।[৬২] আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। "আল্লাহর রসূলুল্লাহ স. লুটতরাজ এবং অঙ্গচ্ছেদ নিষেধ করেছেন।"[৬৩] এছাড়াও নারী, শিশু, বৃদ্ধ, আহত

---

[৬০] আল-কুরআন, ৪:১১৯

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

[৬১] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আদ-দিয়াত আন-রসূলিল্লাহ স., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪০

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَقَالَ: " اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا "

[৬২] ইবনু আল-তুজ্জার, *নাইলু তারীখি বাগদাদ*, বৈরূত: দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি., হাদীস নং ৩৫১, পৃ. ৪২৭

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: " نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم عَنِ الضَّرْبِ عَلَى الْوَجْهِ "

[৬৩] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায়: আল-মাযালিম, অনুচ্ছেদ: আন-নুহবা বি গাইরি ইযনি সাহিবী, পৃ. ৭১৫

ইসলাম যুদ্ধে শত্রুর মৃত্যু পরবর্তী কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকৃতিকে স্বীকৃতি প্রদান করেনি। এ বিধানকে 'মুছলা' বা অঙ্গ বিকৃতিকরণ বলা হয়। মুছলা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এতে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি ঘটে। ইসলামী শরীয়া যুদ্ধকালীন ও শান্তিকালীন উভয় সময়ে উন্নত চরিত্রের পরিচয় দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইসলাম সৃষ্টিজগতের মাঝে মানুষকে একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান প্রদান করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয় আমি আদমের সন্তানদের সম্মানিত করেছি।"[৬৪] এ কারণে ইসলামী শরীয়া মানুষের কোনরূপ অঙ্গ বিকৃতি অনুমোদন করে না। এমনকি ইসলামে পুরুষ ও নারী সবাই মৌলিক মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত। ফলে ইসলামী শরীয়া লিঙ্গ পরিবর্তনকেও কোনভাবেই অনুমোদন করে না। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে একটি লৈঙ্গিক পরিচয়ে এবং বিশেষ গঠনে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার সংগিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।"[৬৫] অর্থাৎ উক্ত আয়াতে পরোক্ষভাবে লৈঙ্গিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং মানুষ চাইলেই সে পরিচয়কে পরিবর্তন করতে পারে না। রসূলুল্লাহ স. ঐ সমস্ত পুরুষের অভিসম্পাত করেছেন যারা নারীদের সদৃশ পোশাক পরে। আর ঐ সমস্ত নারীরও যারা পুরুষদের মত পোশাক পরে।[৬৬] কোন পুরুষ কিংবা নারীর জন্য বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধান যেখানে বৈধ নয়, সেখানে লৈঙ্গিক পরিবর্তন বৈধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তবে ক্ষেত্রবিশেষে ইসলামী শরীয়ার লক্ষ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিপরীত বিধানও লক্ষণীয়। চিকিৎসার মাধ্যমে হিজড়াদের লিঙ্গ নির্দ্ধারণ এর একটি উদাহরণ। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে, হিজড়া বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মানো কোন শিশুর যদি পরিণত বয়সে যাওয়ার আগে চিকিৎসা করা হয়, তাহলে বেশির

حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ، قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سلم عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ "

[৬৪] আল-কুরআন, ১৭:৭০ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

[৬৫] আল-কুরআন, ৪:১ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

[৬৬] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায়ঃ আল-লিবাস, অনুচ্ছেদ : আল-মুতাশাব্বিহীনা বিন নিসা ওয়া আল-মুতাশাব্বিহাত বি আর-রিজাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১৮

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ و سلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ "

ভাগ ক্ষেত্রে তাদের সুস্থ করা সম্ভব। ধর্মীয় দৃষ্টিতে লিঙ্গ নির্ধারণ পূর্বে তারা নারী কিংবা পুরুষ কোন শ্রেণীতে অর্ন্তভুক্ত হয় না। বরং ধর্মীয় কর্ম সম্পাদনকালে পুরুষ-নারীর মধ্যবর্তী স্বাতন্ত্রিক স্তরে বিবেচিত হবে। ফলে নামাযে তারা পুরুষদের পিছনে ও নারীদের সামনে দাড়াঁনোর বিধান রয়েছে।[৬৭] হিজড়া জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসা প্রদান যথাযথ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে একজন নির্ভরযোগ্য ডাক্তারের পরামর্শের ভিত্তিতে তাদের চিকিৎসাপত্র প্রদান অত্যাবশ্যক। তবে তাদের চিকিৎসা প্রদান লিঙ্গ পরিবর্তনের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হবে না। তাদের ক্ষেত্রে এ চিকিৎসাকে লৈঙ্গিক শুদ্ধিকরণ বলা যেতে পারে। এটি আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন কিংবা লৈঙ্গিক পরিবর্তন নয়। এক্ষেত্রে তাদের শারীরিক গঠন বিষয় বিবেচনা করা হবে। পুরুষসুলভ শারীরিক গঠন কিংবা নারীসুলভ বর্ধন ও মল-মূত্রত্যাগ ইত্যাদি বিবেচনা করা হবে। নারী বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য পেলে পুরুষের উপাদান চিকিৎসার মাধ্যমে শুদ্ধ করা হবে। জাবির রা. বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ স. একজন ডাক্তারকে উবাইয়ের নিকট প্রেরণ করেন। ডাক্তার তার একটি রগ কেটে দিয়েছিলেন।[৬৮] ইবনে হাজার আল-আসকালানী র. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, খুনসাদের নারীসুলভ উপাত্ত অপারেশনের মাধ্যমে বর্জন করা বৈধ।[৬৯] ইসলাম এ চিকিৎসা গ্রহণে বৈধতা প্রদান করেছে। তবে জন্মগত খুনসা ছাড়া অন্য কারো জন্য এ চিকিৎসা বৈধ নয়। রসূলুল্লাহ স. অন্য হাদীসে লৈঙ্গিক পরিবর্তনকারীদের অভিসম্পাত করেছেন।[৭০] পুরুষের নারী হওয়া বা নারীর পুরুষ হওয়া বৈধ নয়।

---

[৬৭] ড. ওয়াহবা আয-যুহাইলী, *আল-ফিকহু আল-ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, বৈরূত: দারু আল-ফিকর, ২০০৬, খ. ৪, পৃ.

[৬৮] ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আত-তিব্ব, অনুচ্ছেদ: ফি কাতঈল ঈরক ওয়া মাওযায়িল হাযম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪৪

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم إِلَى أُبَيٍّ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا "

[৬৯] ইবনে হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল-বারী*, অধ্যায়: কিতাবু আত-তিব্ব, অনুচ্ছেদ: ফি কাতঈল ঈরক ওয়া মাওযায়িল হাযম, রিয়াদ: দারুস-সালাম, ১৯৯৭, খ. ১০, পৃ. ১৯২

[৭০] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায়: আল-লিবাস, অনুচ্ছেদ: ইখরাজিল-মুতাশাব্বিহীনা বিন-নিসা মিনাল-বুয়ুতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১৮; ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-আদব, অনুচ্ছেদ: আল-মুতাশাব্বিহাতি মিনার-রিজাল ওয়ান-নিসা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২৮

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ " قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

সৌন্দর্যবর্ধন

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।"[৭১] আল্লাহ তাআলার প্রত্যেকটি সৃষ্টিতে ব্যতিক্রম ও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। তিনি মনুষ্যকূলেও এমন প্রকৃতির মানব সৃষ্টি করেছেন যাদের শারীরিক ও মানসিক গঠন ভিন্ন ভিন্ন। মানব সমাজে জন্মান্ধ, মুক, বধির ও বিকলাঙ্গ ইত্যাদির পাশাপাশি সম্পূর্ণ শারীরিকভাবে সুস্থ মানুষদের মাঝেও মনস্তাত্ত্বিক ও চিন্তাগত বৈচিত্র্য রয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষকে জাতি, বর্ণ, ভাষা ও গোত্র ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়েও সৃষ্টি করেছেন। শারীরিক ও মানসিক দূরত্ব সত্ত্বেও মানুষ হিসেবে আকৃতিগত সৌন্দর্যের পূর্ণতা প্রত্যেকটি মানুষের মাঝেই রয়েছে। নারী-পুরুষ, লম্বা-খাটো, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদি মানুষের দ্বিতীয় স্তরের পরিচয়। সুতরাং মানুষের সৌন্দর্যবর্ধন কিংবা অন্য কোন অযৌক্তিক কারণে তার শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন, বিয়োজন কিংবা পরিবর্তন ইসলামী শরীয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়।

ইসলাম সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য চর্চা শুধু পছন্দই করে না; বরং এর তাকিদ দেয়। আল্লাহ তাআলা সেসব লোককে অপছন্দ করেন, যারা বৈধ সৌন্দর্য চর্চাকে হারাম বা অবৈধ বলে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আপনি বলুন, আল্লাহ তাআলার দেয়া সৌন্দর্য এবং পাক-পবিত্র জিনিস খাবার তোমাদের জন্যে কে হারাম করেছে?"[৭২] আল্লাহ তাআলা নামায আদায়ের আগে পরিপাটি হতে বলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে আদম সন্তান! তোমরা প্রতিটি ইবাদাতের সময়ই তোমাদের সৌন্দর্য গ্রহণ করো।"[৭৩] মহিলাদের স্বভাবের কথা চিন্তা করে ইসলাম সৌন্দর্য চর্চার উপকরণ সোনা ও রেশমের মতো মূল্যবান উপাদান মহিলাদের জন্যে জায়েয করেছে। তবে ইসলাম অকারণে মানুষের কদর্যতা, অসহায়তা, কুৎসিত আকৃতি ধারণ করাকে পছন্দ করে না। তাই যেসব সৌন্দর্য চর্চার ক্ষেত্রে কৈতরাও এবং ভারসাম্য রক্ষা হয় না অথবা আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন হয়, সেসব বিকৃত সাজসজ্জা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টার নামে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি সমর্থন করে না। ফলে শরীরে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে নানা চিত্র অংকন করানো এবং দাঁত শানিত করান ইসলামে নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ স. যে মেয়েলোক দেহে উল্কি (সূচিবিদ্ধ করে চিত্র অংকন) করে এবং যে তা করায়, তার

---

৭১ আল-কুরআন, ৯৫:৪ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

৭২ আল-কুরআন, ৭:৩২ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ

৭৩ আল-কুরআন, ৭:৩১ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।[৭৪] উল্কি হিসেবে খৃস্টানরা নিজেদের হাত ও বুকের ওপর ক্রুশ চিহ্ন আঁকে। আবার কোন কোন ধর্মানুসারীরা তাদের দেব-দেবীর ছবি ও প্রতীকসমূহের চিত্র এঁকে থাকে। এছাড়া উল্কি বানানোর সময় দেহে সূচ বিদ্ধ করা হয় বলে তাতে খুবই কষ্ট ও যন্ত্রণা অনুভূত হয়।

এ কারণে এ কাজ করা ও করানো উভয়ই নিষিদ্ধ। অনেকের দাঁতে স্বাভাবিকভাবে ফাঁক থাকে। সৌন্দর্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দাঁত শানিত করা, তীক্ষ্ণ সরু বানানো, দূরত্ব হ্রাস, খোদাই করা ও কোনরূপ গর্ত রচনা করাকেও ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। "রসূলুল্লাহ স. যে সব স্ত্রীলোক সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দাঁতের মধ্যে খোদাই করায় তাদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন। কেননা তারা আল্লাহর সৃষ্টির স্বাভাবিক অবস্থাকে বিকৃত করে দেয়।"[৭৫] অনুরূপ ভ্রু বা পশম উপড়ানো বিকৃত রূপ ও সৌন্দর্য চর্চার আরেকটি উপায়। অনেকে ভ্রূর চুল উপড়িয়ে তাকে যথাসম্ভব সরু করে নেয়। হাদীসে এসেছে, "যে স্ত্রীলোক চুল বা পশম উপড়ায় এবং অপরের দ্বারা এ কাজ করায় রসূলুল্লাহ স. উভয়ের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।"[৭৬] হানাফী মাযহাবের কোন কোন ইমামের মতে, মেয়েদের মুখমণ্ডলের চুল উপড়িয়ে পরিষ্কার করা, লাল রঙ লাগানো, নকশা আঁকা ও নখে রং লাগানো স্বামীর অনুমতিক্রমে বৈধ। কেননা এসব কাজ সৌন্দর্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু ইমাম নববী মুখমণ্ডলের চুল বা পশম উপড়ানোর তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

মূলত সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অস্ত্রোপচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা এরূপ অস্ত্রোপচার যেমন কষ্টদায়ক তেমনি আল্লাহর দেয়া আকৃতিকে পরিবর্তন করার শামিল। তবে যদি কারো কোন ত্রুটি থাকে, যা মূল দেহ কাঠামোর ওপর অতিরিক্ত এবং তার কারণে কেউ অপমানিত হয় কিংবা মানসিক কষ্টে জর্জরিত হতে থাকে ও জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যায়, তবে তার চিকিৎসা করে অসুবিধা দূর করানো দোষের কিছু নয়।[৭৭]

[৭৪] ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আত-তালাক, অনুচ্ছেদ: মাহরুল বাগী ওয়ান-নিকাহিল ফাসিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬৪।

حدثنا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة

[৭৫] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায়: আল-লিবাস, অনুচ্ছেদ: আল-মুতাফাল্লিজাত, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৫৯৪৮, পৃ. ১৮৩১; ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯০

عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ "

[৭৬] ইমাম আমহদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩৬

[৭৭] ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, অনু: মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ১২৯

তবে অনাকাঙ্খিত কারণে কারো স্বাভাবিক সৌন্দর্যহানি ঘটলে সে ত্রুটি সারাতে সার্জারি করা নিষিদ্ধ নয়। যেমন অসুস্থতা থেকে উদ্ভূত ত্রুটি, ট্রাফিক এক্সিডেন্ট অথবা আগুনে পুড়ে সৃষ্ট ত্রুটি, জন্মগত ত্রুটি হিসেবে অতিরিক্ত আঙ্গুল কেটে দেয়া অথবা অকেজো আঙ্গুল কেটে দেয়ার জন্য অপারেশন করা নিষেধ করা হয়নি। কেননা এ ধরনের অপারেশনে আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন উদ্দেশ্য নয়। হাদীস থেকে এর পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। আরফাজাহ ইবনে আসআদ থেকে বর্ণিত। জাহিলিয়া যুগে এক যুদ্ধে তার নাক কেটে যায়। ফলে তিনি রূপা দিয়ে তৈরি একটি নাক ব্যবহার করেন। তবে তা ময়লায় মলীন হয়ে যেত। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. তাকে স্বর্ণের তৈরি একটি নাক ব্যবহার করতে বলেন।[২৮]

অঙ্গ সংগ্রহ এবং বিপণন

সাধারণত মানবদেহে সংযোজনের নিমিত্তে সরবরাহকৃত অঙ্গের পরিমাণ থেকে চাহিদা সবসময় বেশি থাকে। ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সরবরাহের উদ্দেশ্যে জোর, চাপ ও প্রলোভন ইত্যাদির মতো ঘটনা ঘটে। কিন্তু দাতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনরূপ বিভ্রান্ত বা প্রলোভন দিয়ে প্রতারিত করে কারো কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহ করা বৈধ নয়। যদি কোন সমাজে বা দেশে অঙ্গ সংযোজনের সুযোগ প্রসারের ফলে জীবিত মানুষ অপহরণ করে অথবা প্রলোভন বা হুমকি দিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিনিয়ে নেয়া হয় তবে ঐ রাষ্ট্র সাময়িকভাবে ব্যক্তি স্বার্থের উপর জাতির স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে অঙ্গ সংযোজন কেন্দ্রগুলোর ওপর সর্বদা নিষেধাজ্ঞা বা কঠোর নজরদারি রাখতে পারেন। কেননা সুস্থ মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রয় ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় এক সময় এমন রূপ নিতে পারে যে, এর জন্য মানুষ অপহরণ, প্রলোভন ও প্রতারণায় উৎসাহিত করতে পারে। এ সুযোগ বন্ধ করার জন্য সুস্থ মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাণিজ্যিক বিপণন নিষিদ্ধ। তবে আপনজনের জন্য স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে অঙ্গদান এ নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়বে না। এ বিষয়ে ইসলামী শরীয়া 'ক্ষতির প্রতিরোধ' এবং সৎ উদ্দেশ্য নিশ্চিতকরণ নীতি ও কর্মকৌশলের দ্বারা পরিচালিত হয়। মানবদেহের অঙ্গ সাধারণত স্বেচ্ছায় দানের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। দাতা জীবিত বা মৃত উভয় ধরনের হতে পারে। জীবিত দাতা মুক্ত ব্যক্তি বা ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত আসামী হতে পারে। কোন ব্যক্তির সজ্ঞানে সম্মতি ছাড়া জীবিত বা মৃত অবস্থায় তার অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য সংগ্রহ করা যাবে না। মৃত ব্যক্তির সচল অঙ্গ অপসারণের ব্যাপারে 'পূর্ব দৃষ্টান্ত' বা 'কায়িদা আল-উরফ' হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত মৃত্যুর সংজ্ঞা

---

[২৮] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: লিবাস আর-রসূলিল্লাহ স., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭৭

عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ، قَالَ: أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلاَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

'ব্রেইন ডেথ' কে গ্রহণ করা যায়। কাজেই ব্রেইন ডেথ ব্যক্তিকে 'মৃত ব্যক্তি' মনে করে তার সচল অঙ্গ অন্য মানুষের জীবন বাঁচাতে ব্যবহার করা যায়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরিতে নিষিদ্ধ কিছুর ব্যবহার

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরিতে নিষিদ্ধ কিছু ব্যবহৃত হলে তা মানবদেহে সংযোজন করা নিষিদ্ধ। ইসলামী শরীয়তে যেসব জিনিস খাদ্য বা পানীয় হিসেবে নিষিদ্ধ ঔষধ হিসেবেও ঐসব বস্তু গ্রহণ নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "নিশ্চয় রোগ ও ঔষধ আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত দুটি জিনিস। তিনি প্রত্যেক রোগের নিরাময় ব্যবস্থা করেছেন; সুতরাং তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর, তবে হারাম কোন কিছু দ্বারা চিকিৎসা নিও না।"[৭৯] আবু হুরায়রা রা. বলেন, "রসূলুল্লাহ স. অপবিত্র ঔষধ থেকে নিষেধ করেছেন।"[৮০] বস্তুত নিষিদ্ধ জিনিসের মধ্যে আরোগ্যদানের ক্ষমতা নেই। ইসলামী শরীয়তে মদ নিষিদ্ধ পানীয়। তাই স্বাভাবিকভাবে মদ দিয়ে ঔষধ গ্রহণও হারাম। এ সম্পর্কে তারিক ইবনে সুয়াইদ রা. বলেন, "রসূলুল্লাহ স. কে মদ ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। তখন প্রশ্নকারী বলেন, আমি তো এটা ঔষধ হিসেবে তৈরী করেছি। রসূলুল্লাহ স. বলেন, মদ কখনো ঔষধ হতে পারে না; বরং সে নিজেই রোগের উপাদান।"[৮১] সুতরাং নিষিদ্ধ কোন উপাদান দ্বারা তৈরি কোন প্রকার কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানবদেহে সংযোজন করা যাবে না।

পূর্বাভিজ্ঞতার সংকট

চিকিৎসা পেশায় চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অত্যাবশ্যক। অঙ্গদান ও সংযোজনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থাকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। রসূলুল্লাহ স. স্বল্প অভিজ্ঞতাপূর্ণ চিকিৎসকদের সতর্ক করে বলেন, "পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া যদি

---

[৭৯] ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায়: আত-তিব্ব, অনুচ্ছেদ: ফিল আদবিয়াতিল মাকরূহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪৫

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ"

[৮০] ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায়: আত-তিব্ব, অনুচ্ছেদ: ফিল আদবিয়াতিল মাকরূহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ"

[৮১] ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: আল-আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ: তাহরীমুত-তাদাবিহ বিল-খামর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯১

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ"

কেউ কারো চিকিৎসা করে এবং এতে রোগীর কোন ক্ষতি হয়, তবে রোগীর সব দায়-দায়িত্ব উক্ত চিকিৎসকের ওপর বর্তাবে"।[৮২]

সুপারিশমালা

এক : অঙ্গ সংযোজন বিষয়ে দাতা ও গ্রহীতা উভয় পক্ষের সজ্ঞান ও সুচিন্তিত সম্মতি, ব্যক্তির নিজ দেহের উপর কর্তৃত্ব বিষয়ে সর্বোচ্চ সম্মান দেখানো, দানকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পবিত্রতা, দানশীলতা এবং অন্যের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়াকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় আনতে হবে।

দুই : সুস্থ মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় বন্ধে চিকিৎসক, স্বাস্থ্য পেশাজীবী, আইনপ্রণেতা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সজাগ থাকতে হবে। কেননা কোন ধনী বা সচ্ছল ব্যক্তিকে বাঁচাতে কোন অসচ্ছল বা অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ চিকিৎসা পেশার মহত্ব ও মূল উদ্দেশ্য ধ্বংস করবে। এ জন্য বিভিন্ন আইনে উল্লেখিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় রহিতকরণ সম্পর্কিত পদক্ষেপ কঠোরভাবে বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাণিজ্যিক বিক্রয়ের সুযোগ কঠোরভাবে রোধ করতে হবে।

তিন : সৌন্দর্যবর্ধন কিংবা অন্য কোন অহেতুক কারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন, বিয়োজন কিংবা পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে আইনে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

চার : সাধারণত গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সবকিছু নিরাপদ নিশ্চিত করে কোন অঙ্গ দানকারীর দেহ থেকে নিয়ে গ্রহীতার শরীরে স্থাপন করা হয়। এতে দানকারী ও গ্রহীতা উভয়ের স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবন যাপন নিশ্চিত করা হয়। এর মাধ্যমে উভয়ের মানবিক গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ, গভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে দানকারী ও গ্রহীতা উভয়ের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঁচ : সরকার দেশে অঙ্গ সংযোজন কার্যক্রম বিজ্ঞ আইনবিদ, আলেম ও চিকিৎসক সমন্বয়ে একটি তদারকী বোর্ড গঠন করতে পারেন। যাদের কাজ হবে এধরনের ঘটনা অবহিত হওয়া মাত্রই উদ্যোগী হয়ে এর সমাধানের ব্যবস্থা করা।

---

[৮২] ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আত-তিব্ব, অনুচ্ছেদ: ফি মান তাতাব্বাবা ওয়ালা ইয়্যলামু মিনহু তিব্বুন ফা আ'নাতা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩৯

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي بَعْضُ الْوَفْدِ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى أَبِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و سلم: " أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنٌ "

ছয় : বেসরকারি পর্যায়ে অঙ্গ সংযোজন অনেক ব্যয়বহুল। ফলে দেশের সব নাগরিক এ সুবিধা ও সেবা পায় না। সরকারীভাবে স্থায়ী প্রতিস্থাপন সেন্টার গড়ে তুললে এ ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পাবে। সুতরাং সরকারিভাবে এ ধরনের সেবাকেন্দ্র ও শক্তিশালী অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ প্রয়োজন।

সাত : বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত রোগীদের অনেকেরই রক্তচাপ সব সময় নিয়ন্ত্রণে থাকে না। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে তা খুবই ভয়ংকর। অথচ যদি ডায়াবেটিস ও রক্তচাপ নিয়মিত পরীক্ষা করা যায় তবে শুরুতেই কিডনি রোগ শনাক্ত করা সম্ভব। প্রাথমিক পর্যায়ে কিডনি রোগ ধরা পড়লে এবং উপযুক্ত চিকিৎসা দিলে কিডনি অকেজো রোগে আক্রান্তের সংখ্যা কমানো সম্ভব। বর্তমানে কিডনি দান এবং দানকারী সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন একটি অতি সাধারণ ব্যাপার। ফলে শুধু জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কিডনি সংযোজন গতি লাভ করা সম্ভব। এই সচেতনতার ব্যাপারে মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারের পাশাপাশি গণমাধ্যম ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরও এগিয়ে আসা উচিত।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা প্রেক্ষিতে বলা যায়, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে দুস্থ মানবতার সেবা, আর্তের প্রতি দয়া, দরিদ্র-পীড়িতের দাক্ষিণ্য, বন্যা কবলিত, প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত, দুর্দশাগ্রস্ত ইয়াতিম, মিসকিন, অনাথ ও বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করার তাগিদ করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, তৃষ্ণার্তকে পানি দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান এবং পীড়িতকে সেবা শুশ্রুসার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করা যায়। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষের সেবা করাকে ইসলাম গুরুত্ব প্রদান করেছে। এছাড়া ইসলামী সমাজ মানব জীবনের সমুদয় তৎপরতা নিয়ে যে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তা নৈতিক ও আধ্যাত্মিকসহ অন্যান্য সকল মূল্যবোধের অপূর্ব সংমিশ্রণ। আর সামাজিক সংহতি রক্ষার যে কোন প্রকার বিপদাপদে ব্যক্তি জীবনের নিরাপত্তা বিধানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ যে কোন প্রকার দান নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের পরিচায়ক। এ ক্ষেত্রে ইসলাম প্রথমত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এটি ইসলামী সমাজব্যবস্থার একটি মহৎ উদ্যোগ। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলাম বর্ণ, গোত্র, রক্তের সম্পর্ক ও ভৌগোলিক সীমারেখার চৌহদ্দী পেরিয়ে মানবিকতার সর্বজনীনতায় উজ্জীবিত হতে আহবান জানায়। এটা ইসলামের অন্তর্নিহিত আদর্শ ও প্রাণশক্তি। এর মধ্য দিয়ে ইসলাম সামাজিক প্রেক্ষাপটে গতিশীল শক্তি ও বাস্তব জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮, সংখ্যা-২৯
জানুয়ারী-মার্চ : ২০১২

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচারকের ভূমিকা

এ এইচ এম শওকত আলী*

[সারসংক্ষেপ : আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচারকের ভূমিকা অপরিসীম। একটি কল্যাণকর ও সুশৃংখল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিচারক মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন শাসন। সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় আদালত বা বিচারালয়ই হচ্ছে মানুষের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান, বিচারালয় সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রধানত এই বিষয়টি নিশ্চিত করবে। রাজা-বাদশাহ, শাসক-শাসিত, ধনী-গরীব, আপন-পর কারো জন্যেই আইন প্রয়োগে কোন তারতম্য হবে না, বরং বিচার বিভাগের মূলনীতি হবে- 'দুষ্টের দমন শিষ্টের লালন।' জনগণের মাঝে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ইসলামী বিচারব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আইনের শাসন, আইনের শাসনের গুরুত্ব, বিচারকের মর্যাদা, পক্ষপাতদুষ্ট বিচারকের পরিণাম, বিচারক নিয়োগ, বিচারকের যোগ্যতা, বিচারকের আচরণবিধি, বিচারব্যবস্থায় ইসলামী নীতিমালা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আল-কুরআন ও আল-হাদীসের নির্দেশনা, মহানবী স. এর বিচার বিভাগ, মহানবী স. ও সাহাবাগণের ন্যায়বিচারের নমুনা ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।]

আইনের শাসন

আইনের শাসন বলতে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বিশেষকে বুঝায়, যেখানে সরকারের সকল ক্রিয়াকর্ম আইনের অধীনে পরিচালিত হয় এবং যেখানে আইনের স্থান সবকিছুর উর্ধ্বে। ব্যবহারিক ভাষায় আইনের শাসন অর্থ হল, রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার সর্বদা আইন অনুযায়ী কাজ করবে, যার ফলে রাষ্ট্রের নাগরিকের কোন অধিকার লঙ্ঘিত হলে সে তার প্রতিকার পাবে। আইনের শাসন তখনই বিদ্যমান থাকে যখন সরকারি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অনুশীলন সাধারণ আদালতের পর্যালোচনাধীন থাকে এবং আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার সকল নাগরিকের সমানভাবে থাকে।[1]

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা।

[1] সিরাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলাপিডিয়া, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, খ. ১, পৃ. ১০৪

আইনের শাসনের গুরুত্ব

সমাজের লোকদের মনে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় আইনের শাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বিচারকের উপর। যে সমাজে ন্যায়বিচার নেই, জনগণের ফরিয়াদ পেশ করার মত কোন বিশ্বস্ত স্থান নেই এবং তার প্রতিকার করারও কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই, তা কখনো সমাজ হতে পারে, কখনই সভ্য মানুষের বসবাস উপযোগী সমাজ হতে পারে না। মানুষের জন্য শুধু বিচার নয়, ন্যায়বিচারের প্রয়োজন। ফরিয়াদ পেশ করার একটা স্থান থাকাই যথেষ্ট নয়, তা মনোযোগ সহকারে ও অনুকম্পাপূর্ণ অন্তর নিয়ে ধৈর্যের সাথে শুনবার এবং তার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও ইনসাফপূর্ণ প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থা থাকাও একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় মানুষের জীবন বাসোপযোগী হওয়া ও সে সমাজ মানুষের মানবীয় মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব হতে পারে না।

বিচারকার্য ও জনগণের মধ্যকার পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসাকরণ ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় শুধু বিচারব্যবস্থা থাকলেই হবে না বরং থাকতে হবে সেখানে সর্বতোভাবে ন্যায়সঙ্গত নিরপেক্ষ ও আদর্শভিত্তিক সুবিচার। এ সুবিচার ও ইনসাফ ইসলামী সমাজে মানুষকে দেয় পূর্ণ মানবীয় মর্যাদা নিয়ে বসবাস করার নিরবচ্ছিন্ন অধিকার, নিয়ে আসে শান্তি শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা। প্রত্যেক নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করে তার মানবীয় মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার এবং তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। ফলে গোটা সমাজ ব্যবস্থা হয়ে ওঠে ভারসাম্যপূর্ণ।

আর যদি বিচারের নামে চলে জুলুম-নির্যাতন, শোষণ-বঞ্চনা তাহলে চতুর্দিকে অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, মারামারি, অপহরণ, ছিনতাই, হত্যা ও চুরি ডাকাতি অবধারিত হয়ে পড়ে। সমগ্র সমাজটাই হয়ে পড়ে চরমভাবে বিপর্যস্ত। ফলে রাষ্ট্র তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়। এই অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজন আইনের শাসন। আর এই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী বিচার বিভাগের অধীনে যোগ্যতাসম্পন্ন ও আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার চিন্তায় বিভোর একদল বিচারক।[২]

বিচারকের মর্যাদা

যারা বিচারকার্যে ও শাসন ব্যবস্থায় ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম সেই সকল বিচারকের সীমাহীন মর্যাদা দিয়েছে। ন্যায়বিচারকের মর্যাদার ব্যাপারে মহানবী স. বহু বাণী প্রদান করেছেন। নিম্নে কতিপয় হাদীস উপস্থাপন করা হলো-

---

[২] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃ. ২০৫-২০৬

রসূলুল্লাহ স. বলেন, "বিচারক যখন বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য বিচারকের আসনে বসে, তখন আল্লাহ তাআলা তার নিকট দু'জন ফিরিশতা প্রেরণ করেন। তাঁরা তাকে সৎপথ দেখান এবং যথার্থ বিষয়ে নির্দেশনা দেন। সে ন্যায়বিচার করলে তাঁরা তার সাথে থাকেন আর অবিচার করলে তার প্রতিবাদ করেন এবং তাকে ত্যাগ করেন।"[৩]

মহানবী স. বলেন, "বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিচারক হয়ে বসা আমার নিকট সত্তর বছরের ইবাদতের চেয়েও অধিক প্রিয়।"[৪]

আমর ইবনুল আস রা. বলেন, তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন : "যখন কোন বিচারক যথাযথ চিন্তা গবেষণার পর রায় দেয় এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তার জন্য দু'টি পুরস্কার রয়েছে। আর যদি চিন্তা-গবেষণা করে রায় দেয়া সত্ত্বেও ভুল করেন তবুও তার জন্য একটি পুরস্কার রয়েছে।"[৫]

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন: "যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিচারক নিযুক্ত হওয়ার কামনা করল, অতপর উক্ত পদে আসীন হল, এমতাবস্থায় যদি তার ন্যায়পরায়ণতা তার জুলুম-অত্যাচারের উপরে প্রাধান্য লাভ করে তবে সে জান্নাত লাভ করবে। পক্ষান্তরে তার জুলুম অত্যাচারের দিকটি যদি তার ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রাধান্য লাভ করে তবে সে হবে জাহান্নামী।"[৬]

রসূলুল্লাহ স. বলেন, "ন্যায়বিচারকগণ (কিয়ামতের দিন) দয়াময় মহামহিম আল্লাহর ডানপাশে আলোর মিনারসমূহে অবস্থান করবে, যদিও তাঁর উভয় হস্তই দক্ষিণ হস্ত"।[৭]

রসূলুল্লাহ স. বলেন, "ন্যায়পরায়ণ বিচারক কিয়ামতের দিন আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে।"[৮]

---

[৩] ড. ওয়াহবা আল-যুহাবলী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৮৯, খ. ৬, পৃ. ৪৮০

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮১

[৫] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায়: আল-ইতিসাম, অনুচ্ছেদ: আজরুল হাকীম ইযা ইজতাহাদা ফা-আসাবা আও আখতা, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ৯৮২

[৬] ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-কাযা, অনুচ্ছেদ: ফিল-কাযী ইউখতি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১৪৮৮

[৭] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়: আল-ইমারাত, অনুচ্ছেদ: ফাদীলাতুল ইমামিল আদিল, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১০০৫-১০০৬

[৮] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, আল-কাহেরা: মাতবাআ আশ-শারিকাহ ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫, তা. বি, পৃ. ২২

মহানবী স. বলেছেন: "মহান আল্লাহ বিচারকের সাথে থাকেন, যতক্ষণ না সে অন্যায় রায় দেয়। সে অন্যায় রায় দিলে আল্লাহ তাকে নিজের যিম্মায় ছেড়ে দেন।"[৯]

পক্ষপাতদুষ্ট বিচারকের পরিণাম

বিচারকের পদ যেমন গুরুত্ববহ ও মর্যাদাপূর্ণ, তেমনি তার দায়িত্বও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বিচারক আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করতে বাধ্য। অন্যথায় তাকে কাফির, ফাসিক ও জালিমরূপে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে। কারণ আল্লাহ ও তাঁর রসূল স. এর নির্দেশ বর্তমান থাকা অবস্থায় বিচারকের বিকল্প চিন্তা করার কোন অধিকার নেই। কুরআন-সুন্নাহর বিধানের বিপরীত বিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালাকারী পক্ষপাতদুষ্ট বিচারকের করুণ পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী স. হাদীসে বিভিন্ন ঘোষণা দিয়েছেন।

১. আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা বিচার-ফায়সালা করে না তারা কাফির, জালিম, ফাসিক।"[১০]
২. আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে ফায়সালা দিলে মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার নেই। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হলো।"[১১]

রসূলুল্লাহ স. বলেন, "বিচারক অন্যায় না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। যখন সে জুলুম করে তখন আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন না এবং শয়তান তার সঙ্গী হয়ে যায়।"[১২]

বিচার এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয় যে, যার বিনিময় জান্নাত অথবা জাহান্নাম। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "বিচারক তিন ধরনের হয়ে থাকে। এক প্রকার বিচারক জান্নাতী হবে। আর দুই প্রকার বিচারক জাহান্নামী হবে। জান্নাতী বিচারক

---

[৯] ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : আত-তাগলিযু ফিল হাইফি ওয়ার-রিশওয়াহ, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ২৬১৫

[১০] আল-কুরআন, ৫ : ৪৪,৪৫,৪৭

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ- وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ- وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ-

[১১] আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৬

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

[১২] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ: মা জাআ ফিল ইমামিল আদিল, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১৭৮৫

হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান রেখে সেই মুতাবিক ফায়সালা করেছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যথাযথ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আদেশদানের ক্ষেত্রে অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে সে হবে জাহান্নামী। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা সত্ত্বেও বিচারকার্য সম্পাদন করে সেও জাহান্নামী হবে।"[১৩]

ইমাম জাফর সাদেক র. বলেছেন, "সমাজে সাধারণত চার প্রকারের বিচারক দেখা যায়। তাদের মধ্যে তিন শ্রেণীর বিচারকই জাহান্নামে যাবে। কেবল এক শ্রেণীর বিচারক জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে তিন শ্রেণীর বিচারক জাহান্নামে যাবে তারা হলো: (১) যে বিচারক স্বজ্ঞানে অবিচার করে, (২) যে বিচারক না জেনে অবিচার করে এবং (৩) যে বিচারক না জেনেও সঠিক বিচার করে। (৪) প্রকৃতপক্ষে সেই বিচারকই জান্নাতে প্রবেশ করবে যে জেনে-শুনে সুবিচার করে।"[১৪]

মহানবী স. সর্বদা আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতেন যাতে কখনো তাঁর দ্বারা অবিচার না হয়ে যায়। আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ স. বলেন, "মহানবী স. ভুল বিচার করা থেকে পানাহ চাইতেন।"[১৫]

মহানবী স. আরো বলেন, "যাকে জনগণের বিচারক নিয়োগ করা হলো তাকে ছুরি ছাড়াই জবাই করা হলো।"[১৬] অর্থাৎ তার উপর একটা কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করা হলো।

বিচারক নিয়োগ

জনসাধারণের পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিচারক নিয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য, যিনি জুলুমের অবসান ঘটিয়ে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা দাউদ আ. কে লক্ষ করে বলেন, "হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) করেছি। অতএব, তুমি জনগণের মধ্যে সুবিচার করবে।"[১৭]

আল্লাহর বিধান মোতাবেক বিবাদ ন্যায়ানুগভাবে নিষ্পত্তি করা বিচারকের দায়িত্ব। এ লক্ষে বিচারক নিয়োগও নিঃসন্দেহে একটি ফরয দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে মহানবী স. এর একটি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রসূলুল্লাহ স. মুআয ইবনে জাবাল রা. কে

---

[১৩] ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আকযিয়া, অনুচ্ছেদ : ফিল কাযী ইউখতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮৮

[১৪] গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, তৃতীয় ভাগ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১, পৃ. ২৭৪

[১৫] ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-ইসতিআযাহ, অনুচ্ছেদ: আল-ইসতিআযাতু মিন সুইল কাযা, দেওবন্দ: আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, ১৩৫০, খ. ২, পৃ. ২৬৯

[১৬] ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : যিকরুল কুযাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১৫

[১৭] আল-কুরআন, ৩৮ : ২৬ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

মক্কায় বিচারক নিয়োগ করেন। এতে প্রমাণিত হয় সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের একটি অন্যতম ফরয কর্তব্য হচ্ছে বিচারক নিয়োগ করা।[১৮]

মহানবী স. নিজে বিচারকার্য সম্পন্ন করার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাদেশিক কাযী নিয়োগ করতেন। কখনও প্রদেশের গভর্নরকে উপযুক্ত ব্যক্তিকে কাযী বা বিচারক পদে নিয়োগের জন্য নির্দেশ দিতেন।[১৯]

বিচারকের যোগ্যতা

সমাজে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচারক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যদি তার মধ্যে প্রকৃত যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা ও প্রয়োজনীয় উপযুক্ততা পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান থাকে। বিচারকার্য পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বিচারকের পদ দেয়া এবং তা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। কারণ তার অবর্তমানে উক্ত পদে অযোগ্য ও অসৎ ব্যক্তি নিয়োগ লাভ করলে বিচারকার্য বিঘ্নিত হবে এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হবে। তাই যোগ্যতা সম্পন্ন বিচারক নিয়োগে ইসলাম অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে বিচারক হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্তগুলো নিম্নরূপ-

১.মুসলমান হওয়া ২. স্বাধীন হওয়া ৩.বুদ্ধিমান ও বালেগ হওয়া ৪. আহকামে শরীআ সম্পর্কে জ্ঞানবান হওয়া ৫. সামর্থ্যবান দৈহিকভাবে হওয়া ৬. মৌলিকভাবে ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া ৭. তাকওয়ার গুণ সম্পন্ন হওয়া ৮. বিচারকার্যে নিরপেক্ষ হওয়া ৯. ইজতিহাদ করার যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া ১০. শ্রবণশক্তি, চক্ষুমান ও বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া।[২০]

আলী রা. তাঁর গভর্নর মালিক ইবনে হারিস আল-আশতারীকে লক্ষ করে বিচারকের গুণাবলি সম্পর্কে যে মতামত দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ-

(১) সমস্যার জটিলতা কিংবা সংখ্যার আধিক্যের কারণে তাদের (বিচারকদের) কখনও মেজাজের ভারসাম্য হারানো উচিত নয়।

(২) তারা লোভী, দুর্নীতিপরায়ণ ও চরিত্রহীন হতে পারবেন না।

(৩) যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি অভিযোগের সকল দিক সার্বিকভাবে যাচাই করে দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিশ্চিত হওয়া অনুচিত। যখন অস্পষ্টতা ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন আরো বিস্তারিত অনুসন্ধান চালিয়ে বিষয়গুলো স্পষ্ট করে অতপর রায় প্রদান করা উচিত।

---

[১৮] আল-কাসানী, *বাদাইউস সানাই ফী তারতীবিশ শারাই*, বৈরূত: দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৯৮২, খ. ৫, পৃ. ৪৩৮

[১৯] মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *মহানবীর সচিবালয়*, ঢাকা: নূর প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃ. ১৩

[২০] সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী*, অধ্যায়: আদাবুল কাযী, বৈরূত : দারু ইহয়াউত তুরাস আল-আরাবী, ১৯৮৬, খ. ৩, পৃ.১১

(৪) তাদের অবশ্যই যুক্তি-প্রমাণের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে এবং তাদের কখনও মামলার দীর্ঘ কৈফিয়ত শুনবার ব্যাপারে অধৈর্য হলে চলবে না।

(৫) যাদের প্রশংসা করা হলে আত্মদর্পী হয়ে ওঠে এবং যারা তোষামোদে গলে যায় আর চাটুকারিতা ও প্ররোচণায় বিপথগামী হয় তাদেরকে যেন বিচারক নিয়োগ না করা হয়।[২১]

রসূলুল্লাহ স. বিচারক নিয়োগের সময় সাহাবীদের মধ্যে যারা ফকীহ ছিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল স. এর প্রতি আনুগত্য, তাকওয়া, প্রজ্ঞা, কুরআন ও হাদীসে বিশেষজ্ঞ, শৃংখলা বিধানের যোগ্যতা, মানসিক ভারসাম্য, উদ্ভাবনী ও বিশ্লেষণী শক্তি, কর্মের দক্ষতা, দৃঢ় মনোবল, আমানতদারী ও উন্নত আমল আখলাকে যারা সর্বোত্তম ছিলেন তাদেরকেই বিচারক নিয়োগে অগ্রাধিকার দিতেন।[২২]

শরয়ী আইন অনুযায়ী বিচারককে একজন আদর্শ জীবনযাপনকারী ও শরীয়তের বিধান সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল মুসলিম হতে হবে। অধিকাংশ মাযহাবে এমনও দাবি করা হত যে, রায়ে ব্যবহার্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিচারককে মুজতাহিদ হতে হবে। ইসলামী আইনের মূল উৎস হতে স্বাধীনভাবে আইন উদ্ভাবনের যোগ্যতা থাকতে হবে। পরবর্তীকালে অবশ্য কাউকে আইনের নিজস্ব ব্যাখ্যাদানের উপযুক্ত বিবেচনা করা হত না। বিচারপতিরা শুধু মুকাল্লিদ হতে পারতেন। তাদেরকে পূর্বের প্রামাণিক ইমামদের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হতো। সুতরাং বিচারককে রায়দানের সময় তার মাযহাবের ফিকহ গ্রন্থে যে সকল নিয়ম লিখিত আছে, কঠোরভাবে তার অনুসরণ করতে হতো।[২৩]

ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফিঈ র. এ ব্যাপারে একমত যে, ঐ ব্যক্তির জন্য বিচারক নিযুক্ত হওয়া বৈধ নয় যে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, তাকওয়া ও দূরদর্শিতার গভীর দক্ষতা রাখে না। ইমাম মালিক র. বলেন, "বিচার কার্য সমাধা করার জন্য ইলম, তাকওয়া ও দূরদর্শিতা প্রয়োজন। আজ আমি সবগুলো বৈশিষ্ট্য কারো মধ্যে দেখি না, যদি ইলম ও তাকওয়া এ দু'টো বৈশিষ্ট্যও থাকে তবু আমি তাকে বিচারক নিযুক্ত করার পরামর্শ দিচ্ছি।" আবদুল মালিক ইবনু হাবীব র. বলেছেন, "যদি ইলম নাও থাকে শুধু তাকওয়া এবং জ্ঞান-বুদ্ধি থাকে তবুও ঠিক আছে, কেননা সে বুদ্ধির দ্বারা অপরের নিকট থেকে জেনে নিতে পারবে। যার কারণে তার মধ্যে সদগুণাবলি সৃষ্টি হতে পারে, আর তাকওয়া-পরহেজগারির বদৌলতে সে

---

[২১] গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

[২২] শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, *ইসলাম: রাষ্ট্র ও সমাজ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ৪৩

[২৩] আ ক ম আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, খ. ১, পৃ. ২৯১

সমস্ত খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে এবং যদি ইলম অর্জন করতে চায় তাও পারবে। পক্ষান্তরে বিবেক বুদ্ধি যদি না থাকে তবে সে কোনো কাজেই আসবে না।"[২৪]

ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হলে বিচার বিভাগের বিচারকদেরকে সুবিবেচক হতে হবে এবং বিচারককে হতে হবে উন্নত চরিত্রের অধিকারী ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন। বিচার বিভাগ সমাজে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে যদি বিচারকের প্রকৃত যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও সেজন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ততা পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান থাকে এবং যোগ্যতার জন্য জরুরী শর্তাবলী পুরোপুরি পাওয়া যায়। বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে ইসলামই সর্বপ্রথম বিচারকের জন্য কতগুলো গুণের শর্ত করেছে। এর পূর্বে কোন সময়ই এর প্রতি এতো গুরুত্বারোপ করা হয়নি।[২৫]

বিচারকের গুণাবলি নিম্নরূপ-

১. পূর্ণ বয়স্ক হওয়া
৩. ঈমানদার হওয়া
২. বিবেক বুদ্ধির সুস্থতা
৪. স্বভাবজাত ন্যায়নিষ্ঠতা ও পক্ষপাতহীন হওয়া
৫. জন্মের পবিত্রতা
৬. আইন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী ও বিচক্ষণ হওয়া
৭. সামর্থ্যবান দৈহিকভাবে হওয়া
৮. তীক্ষ্ণ, ধীসম্পন্ন ও প্রতিভাবান হওয়া[২৬]

বিচারকের আচরণবিধি

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত বিচারক নিয়োগের পর বিচারকের জন্য কতিপয় নিয়ম-নীতি ইসলাম নির্ধারণ করেছে। যেগুলো যথাযথভাবে পালন করলে বিচারক বিচারের নামে অবিচার ও জুলুম করা থেকে রক্ষা পাবে। বিচারকের নিয়ম-নীতি দু'ধরনের। এক ধরনের নিয়ম-নীতি পসন্দনীয় এবং অপর ধরনের নিয়ম-নীতি অপসন্দনীয়।[২৭]

---

[২৪] ইমাম আল-কুরতুবী, *আকযিয়াতুর রাসূল*, অনু. মাওলানা মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন, রাসূলুল্লাহ স.-এর বিচারালয়, ঢাকা : মারুফ পাবলিকেশন, ১৯৯৩, পৃ. ৩৫

[২৫] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*, প্রাগুক্ত, ১৯৮৫, পৃ. ২৬২

[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

[২৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

পসন্দনীয় নিয়ম-আচরণবিধি

ক) বিচারকের নিজস্ব ক্ষমতাধীন এমন এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে হবে যে জনগণের যাবতীয় সমস্যা-মামলা তাঁর সম্মুখে একের পর এক পেশ করবেন।

খ) বিচারকের আদালত এমন এক স্থানে হতে হবে, যেখানে সকল লোকের পক্ষে উপস্থিত হওয়া সহজ হয়।

গ) বিচারকের আদালত প্রশস্ত, প্রকাশমান ও সুপরিবেশ সম্পন্ন হতে হবে, যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বীয় বক্তব্য পেশ করা সহজ হয়।

ঘ) আইনবিদদের এমন একটা সমষ্টি বিচারকের নিকট উপস্থিত থাকতে হবে, যেন বিচারক কোনরূপ ভুল করলে তারা তাকে সংশোধন করে দিতে পারেন।

ঙ) বিচারক পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সীমালংঘনমূলক কাজ করলে তাকে নম্রতা সহকারে বুঝিয়ে দিতে হবে।

অপছন্দনীয় আচরণ

ক) বিচারের সময় দ্বাররক্ষী নিয়োগ করা।

খ) ক্রুদ্ধ অবস্থায় বিচারকের রায় লেখা ও রায় দেয়া। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন: "যে লোক বিচারক হওয়ার বিপদে পড়বে, সে যেন ক্রুদ্ধ অবস্থায় কখ্খনোই বিচারের কাজ না করে।"

গ) রায় লেখার সময় বিচারকের ক্ষুধা, পিপাসা, দুশ্চিন্তা, অত্যধিক আনন্দ-ফূর্তি প্রভৃতিতে মশগুল থাকা।

ঘ) তাড়াহুড়া করে, গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও বিবেচনা না করে, উভয় পক্ষের বক্তব্য ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য সূক্ষ্মভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণ না করে রায় লেখা। মহানবী স. এর উক্তি "দুই ব্যক্তি যদি তোমার নিকট বিচারপ্রার্থী হয় তাহলে প্রথমজনের জন্য রায় দেয়ার পূর্বেই দ্বিতীয়জনের বক্তব্য শুনে নিবে। যদি তুমি সেরূপ কর তাহলে তোমার বিচারকার্য সুষ্ঠু ও সুস্পষ্ট হবে।"[২৮]

বিচারকের জন্য কতিপয় বাধ্যবাধকতা

১. সালাম, সম্মান প্রদর্শন, আসন গ্রহণ, দৃষ্টিদান, কথাবার্তা বলা প্রভৃতির দিক দিয়ে বিচারক বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের মধ্যে পূর্ণ সমতা রক্ষা করে চলবেন।

২. এক পক্ষকে অপর পক্ষের জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদির পরামর্শ না দেয়া।

৩. একজনের সাথে সাগ্রহে কথা না বলা, যাতে অন্যপক্ষ নিজকে অপমানিত ও অসহায় বোধ করতে বাধ্য হয়।

---

[২৮] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায়: আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ: হাল ইয়াকযিল কাযী আও য়্যুফতি ওয়া হুয়া গাদাবুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৬

৪. দুই পক্ষই যখন মামলায় প্রবৃত্ত হবে এবং বিচার্য বিষয়টিও হবে সুস্পষ্ট, তখন বিচারকার্য সম্পাদন করা কর্তব্য। তবে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা করে দিতে চেষ্টা করা তখনো বাঞ্ছনীয়। আর বিচার্য বিষয় যদি দুর্বোধ্য ও কঠিন হয় তাহলে এ কাজটিকে বিলম্বিত করবে। বিলম্বিত করার সীমা তখন পর্যন্ত প্রসারিত হবে, যখন পর্যন্ত ব্যাপারটি স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে না উঠছে।

৫. মামলা যে পরম্পরায় দাখিল হবে, বিচার সেই অনুযায়ী সমাধা করতে হবে।

৬. বিবাদী যদি এমন কোন দাবি পেশ করে যার ফলে বাদীর দাবি চূড়ান্ত হয়ে যায়, তা হলে তা অবশ্যই শুনতে হবে এবং বাদীর নিকট থেকে তার জবাবও জেনে নিতে হবে।

৭. বাদীপক্ষ বা বিবাদী নিজ নিজ দাবি প্রত্যাহার করলে বিচারক মামলা খারিজ করে দেবেন।[২৯]

বিচারব্যবস্থায় ইসলামী নীতিমালা

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ইনসাফ ও ন্যায়বিচার বিশেষভাবে উপেক্ষিত, এহেন পরিস্থিতিতে কুরআন-হাদীস তথা রসূল করীম স.-এর অনুসৃত নীতি ও বিচার-ফায়সালাই কেবল মানব সমাজে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

ইসলামী শরীয়ার আলোকে যে ব্যক্তি বিচার-ফায়সালা করতে চায়, তার এমন কোন স্বাধীনতা নেই যে, আল্লাহ তাঁর কিতাবে যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং যার আলোকে রসূল স. ফায়সালা করেছেন এবং যেসব ক্ষেত্রে সাহাবীদের ইজমা রয়েছে, তা বাদ দিয়ে নিজের ইচ্ছে মতো কোনো ফায়সালা দেবে। আল-কুরআন, সুন্নাতে রসূল ও সাহাবাদের ইজমা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে বিচার-ফায়সালার পথনির্দেশনা নেয়া যাবে না।

মুহাম্মাদ স. নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ওহী ভিত্তিক আর যারা বিচার কাজ পরিচালনা করতেন, তাঁর প্রচেষ্টায় ইসলামী আইন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। আল্লাহর নির্দেশনার আলোকে তিনি ইসলামী আইনের মৌলিক ধারা উপধারা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করারও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। মুহাম্মাদ স. কর্তৃক জারীকৃত উক্ত আইনের বৈশিষ্ট্য এই যে, এই আইন মানুষের জ্ঞান প্রসূত নয় বরং এই আইনের কাঠামো মহান আল্লাহ হতে দু'ধরনের ওহী মারফত তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন। এক ওহীয়ে মাতলু বা সরাসরি ওহী কুরআন মাজীদ, দুই ওহীয়ে গায়রে মাতলু বা পরোক্ষ ওহী। কুরআনুল কারীমে উল্লেখ আছে, "এবং সে মনগড়া কথা বলে না, এতো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।"[৩১]

---

[২৯] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

[৩০] ইমাম আল-কুরতুবী, *রাসূলুল্লাহ স.-এর বিচারালয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[৩১] আল-কুরআন, ৫৩ :৩-৪ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ওহীর জ্ঞানের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিচার-আচার এবং যাবতীয় ফায়সালা মেনে নেয়া ঈমানের অঙ্গ, কেউ এ বিষয়কে অস্বীকার করলে সে মুমিন থাকে না। এ কথা বিবেচনায় রেখে কুরআন-সুন্নাহকে মৌলিক উৎস গণ্য করে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের সফল বাস্তবায়ন করার জন্য পন্থা উদ্ভাবন করা এবং নীতি প্রণয়ন করা বৈধ। রসূলুল্লাহ স. ও পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীন সেই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। রসূলুল্লাহ স. এই নীতি গ্রহণের মাধ্যমে সেই ব্যবস্থাই চালু করেছেন। ফলে এই নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করার সুযোগ নেই।[৩২]

আল-কুরআনে এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ "রসুল তোমাদেরকে যা দান করে তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদের নিষেধ করে তা পরিত্যাগ কর।"[৩৩]

রসূলুল্লাহ স. তাঁর জীবদ্দশায় যে সকল বিচার-ফায়সালা করতেন সাহাবা কিরাম তা সর্বান্তকরণে মেনে নিতেন। রসূলুল্লাহ স. যে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন, তা লংঘন করা গুরুতর অপরাধ। তাঁর সকল সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার মধ্যেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহর মৌলিক নীতিকে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা আইনী ফায়সালা দান করার ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয় তাকে ইজতিহাদ বলা হয়। রসূলুল্লাহ স. ও সাহাবীগণ কর্তৃক এই প্রক্রিয়া স্বীকৃত। মুসলিম উম্মাহর ইজতিহাদের এই প্রক্রিয়ায় রসূলুল্লাহ স. এর সম্মতি ছিল।[৩৪]

রসূলুল্লাহ স. যখন মু'আয ইবনে জাবাল রা. কে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে বিচারকর্ম করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী। রসূলুল্লাহ স. বললেন, যদি আল্লাহর কিতাবে না পাওয়া যায়? তিনি বললেন, আল্লাহর রসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী। তিনি বললেন, যদি সুন্নাতে রসূলেও না পাওয়া যায়? তিনি বললেন, আমার নিজের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা সমাধান করতে চেষ্টা করব। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ স. বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর রসূলের প্রতিনিধিকে এমন পন্থা অবলম্বনের তাওফীক দান করেছেন যা আল্লাহর রসূলের নিকট পসন্দনীয়।[৩৫]

---

[৩২] অধ্যাপক এ টি এম মুসলেহ উদ্দিন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, খ. ৪, পৃ. ১৯১

[৩৩] আল-কুরআন, ৫৯ : ৭

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب

[৩৪] অধ্যাপক এ টি এম মুসলেহ উদ্দিন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯২

[৩৫] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ: মা জাআ ফিল কাযি কাইফা ইয়াকযি, আল-কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৫, খ. ৩, পৃ. ৩৯৭।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, "যদি এমন কোন বিষয় তোমার নিকট উপস্থিত হয় যার বিধান আল্লাহর কিতাবে নেই, রসূলের বিধানেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেই এবং সালেহীন অর্থাৎ উম্মতের ন্যায়পরায়ণ ও যোগ্য সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের ইজতিহাদেও তা পাওয়া না যায়, তা হলে সেই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করবে। কখনও এই কথা বলবে না, আমি এই বিষয়ে ভয় পাচ্ছি, আমি ভয় করছি।"[৩৬]

ন্যায়বিচার ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই রসূলুল্লাহ স. এর আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য। তিনি সমাজ জীবন সুশৃংখল করতে এবং অনাগত ভবিষ্যতে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা প্রয়োগ করার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান, বিশেষ করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সাহাবা কিরামকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর এই দিকনির্দেশনার মাধ্যমেই ইসলামের আইন ও বিচারব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে।

ঈসা আ. কে তুলে নেয়ার পর প্রায় ৫০০শত বছর পৃথিবীতে কোন নবীর আগমন ঘটেনি। এ সময় বিশ্ব অজ্ঞতা ও অমানিশায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। আইন শৃংখলা বলতে তেমন কিছু ছিল না। আইন শৃংখলার অভাবে সমাজের কোন স্তরে শান্তি বিরাজিত ছিল না। 'জোর যার মুল্লুক তার' অবস্থা বিরাজমান ছিল। নিজেদের সুবিধামত মানুষ নিজেরাই আইন তৈরী করে নিতো। ফলে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, পৃথিবীবাসী একজন নবী আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে প্রহর গুণছিল। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ স. কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তিনি ওহী প্রাপ্ত হয়ে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে বড় হয়েও তৎকালীন জাহেলী সমাজে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরত চেষ্টা চালিয়েছেন।[৩৭]

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আল-কুরআনের নির্দেশনা

আমাদের সমাজের একদল মানুষ ইসলামী দর্শনকে শুধু ব্যক্তি জীবনের জন্য কার্যকর মনে করে। তারা কোন অবস্থায় ইসলামকে সর্বজনীন একমাত্র জীবন বিধান হিসাবে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। অথচ কুরআনের আইন দ্বারা একসময় বিশ্বব্যবস্থা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে মহানবী স.-এর মাদানী জীবন এবং বিশেষত খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলের কথা উল্লেখ করা যায়। মহান আল্লাহ পবিত্র

---

[৩৬] ইমাম নাসাঈ, *আস-সুনান*, অধ্যায়ঃ আদাবুল কুযাত, অনুচ্ছেদঃ আল হুকমু বি ইত্তিফাকি আহলিল ইলম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬০।

[৩৭] অধ্যাপক এ টি এম মুসলেহ উদ্দিন ও অন্যান্য সম্পাদিত; *সীরাত বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯৪

কুরআনের বহু স্থানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। তন্মধ্যে কতিপয় আয়াত উল্লেখ করা হলো -

* আল্লাহ তোমাদের হুকুম দিচ্ছেন, আমানত তার প্রাপকের হাতে তুলে দাও। আর যখন লোকদের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ইনসাফের ভিত্তিতে বিচার করবে।[৩৮]

* কিন্তু না, যতক্ষণ তোমার রবের কসম, তারা ঈমানদার হতে পারবে না; যে পর্যন্ত তারা নিজেদের মতবিরোধের বিষয়ে তোমাকে বিচারক হিসেবে মেনে না নেয়, তারপর যে ফায়সালাই তুমি দাও তা মেনে নিতে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং তা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে।[৩৯]

* আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন।[৪০]

* তুমি যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায় বিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।[৪১]

* যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য বলবে, আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্কে হলেও এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করবে।"[৪২]

* যদি তারা ফিরে আসে তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায় ভিত্তিক ফায়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।"[৪৩]

* হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষ্য স্বরূপ, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়। সে ধনী হোক বা গরীব হোক আল্লাহ তোমাদের চেয়ে বেশী তাদের হিতকামী। কাজেই প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ে গিয়ে ন্যায়বিচার থেকে বিরত থেকো না। যদি তোমরা

---

[৩৮] আল-কুরআন, ৪ : ৫৮

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ

[৩৯] আল-কুরআন, ৪ : ৬৫

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

[৪০] আল-কুরআন, ১৬ : ৯০ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى

[৪১] আল-কুরআন, ৫ : ৪২ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

[৪২] আল-কুরআন, ৬ : ১৫২ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ

[৪৩] আল-কুরআন, ৪৯ : ৯ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

পেঁচালো কথা বল বা সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাও তাহলে জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।"[৪৪]

* হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে সত্যের উপর কায়েম থাক এবং ইনসাফের সাক্ষী হও। কোন দলের দুশমনী যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর। এটাই তাকওয়ার কাছাকাছি। আল্লাহকে ভয় করে চলো।[৪৫]

* আল্লাহর নাযিল করা বিধান মোতাবেক তুমি জনগণের মধ্যে বিচার-ফায়সালা কর।[৪৬]

*বল, আমার রব তো ইনসাফের হুকুম দিয়েছেন।[৪৭]

* নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের পসন্দ করেন।[৪৮]

* আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে।[৪৯]

আল-হাদীসে ন্যায়বিচার প্রসঙ্গ

মহানবী স. মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ বিষয়ে মহানবী স. বলেছেন :

* তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে বিচার করার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম।[৫০]
* দুই পক্ষের মধ্যে সুবিচার করে দেয়া সাদকাহ স্বরূপ।"[৫১]

---

[৪৪] আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

[৪৫] আল-কুরআন, ৫ : ৮
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ

[৪৬] আল-কুরআন, ৫ : ৪৯ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

[৪৭] আল-কুরআন, ৭ : ২৯ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

[৪৮] আল-কুরআন, ৬০ : ৮ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

[৪৯] আল-কুরআন, ৪২ : ১৫ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ

[৫০] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-মুসাকাত, অনুচ্ছেদ : মান ইসতাসলাফা শাইয়ান ফাকাযা খাইরান মিনহু ও খায়রুকুম আহসানুকুম কাযাআ, বৈরূত: দারুল মা'রিফা; ২০০৩, খ. ১১, পৃ.৩৭

[৫১] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : বায়ানু আন্না ইসমাস ছাদাকা, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৮৬

* ক্রোধাবস্থায় দু'পক্ষের মধ্যে বিচার করা বিচারকের জন্য শোভনীয় নয়।[৫২]

* আল্লাহ বিচার কার্যে ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষ দাতাকে লানত করেছেন।[৫৩]

* যদি কোন জাতির মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত না থাকে তখন তাদের মধ্যে রক্তপাত ছড়িয়ে পড়ে।"[৫৪]

* নবী স. আলী রা. কে বলেন, যখন দুই ব্যক্তি তোমার নিকট বিচার প্রার্থনা করে তখন তুমি দ্বিতীয় ব্যক্তির বক্তব্য না শুনে প্রথম ব্যক্তির বক্তব্যের ভিত্তিতে রায় দিও না। অচিরেই তুমি জানতে পারবে তুমি কিভাবে ফায়সালা করছো।[৫৫]

* নবী স. বলেন, "হে সাদ! তুমি যখন বিচার ফায়সালা করবে, ভাগ-বাটোয়ারা করবে এবং কোন কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করবে তখন আল্লাহকে ভয় করবে।"[৫৬]

মহানবী স.-এর বিচার বিভাগ

রসূলুল্লাহ স. ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও বিচারক। তিনি প্রাদেশিক ও স্থানীয় বিচারপতিদের নিয়োগ দিতেন। মসজিদে নববী ছিল একাধারে মসজিদ ও মুসলমানদের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। প্রশাসনিক কার্যক্রমের বিস্তৃতির ফলে পরবর্তীকালে বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য রসূলুল্লাহ স. বহু সংখ্যক সাহাবীকে বিচারক নিয়োগ করেন। আবু বকর রা., উমর রা., উসমান রা., আলী রা., আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা., মুআজ ইবনে জাবাল রা., আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা. ও উবাই ইবনে কা'ব রা. রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।[৫৭]

রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে কোন মামলা দায়ের করা হলে তিনি সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া কোন রায় দিতেন না। সাক্ষ্য প্রমাণ না পেলে বিবাদীর কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করতেন। আর যদি কোন ব্যাপারে দু'জন দাবিদার হতো এবং উভয়েই তাদের দাবির পক্ষে

---

[৫২] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-আকযিয়া,অনুচ্ছেদ : কারাহাতু কাযাইল কাযী, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ২৪১

[৫৩] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, আল-কাহেরা:দারুল হাদিস, ১৯৯৫, খ. ৯, পৃ. ৮১

[৫৪] ইমাম মালিক, *আল-মুয়াত্তা*, অধ্যায়: আল-জিহাদ, অনুচ্ছেদ:মা জাআ ফিলগালূল, দেওবন্দ:আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া,তা.বি. পৃ.১৭৩

[৫৫] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : লা ইয়াকযী বাইনাল খাসমাইনে হাত্তা ইয়াসমাআ কালামাহুমা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯

[৫৬] ইমাম ইবনে মাজা, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আয-যুহদ, অনুচ্ছেদ : আয-যুহদু ফিদ দুনইয়া, আল- কাহেরা :দারুল হাদীস, ২০০৫, খ. ৩, পৃ. ৪৬৮

[৫৭] শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *ইসলাম : রাষ্ট্র ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

সাক্ষ্য পেশ করতো তাহলে তিনি তাদের থেকে শপথ গ্রহণ করতেন। মুসলিম কিংবা অমুসলিম সবার জন্যই এ আইন প্রযোজ্য ছিল।[৫৮]

ন্যায়বিচারের স্বার্থে মহানবী স. বিচারকালে বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষকে নৈতিক উপদেশ দান করতেন এবং আখিরাতের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করতেন। কারণ ন্যায়বিচার প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণরূপে বাদী-বিবাদীর সত্য বক্তব্য, সাক্ষ্য প্রমাণ এবং বিচারকের প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও অন্তরদৃষ্টির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এর ব্যত্যয় ঘটলে যে কোন পক্ষ ইনসাফ থেকে বঞ্চিত হতে পারে। তাই মহানবী স. বলেন, "মানুষ চিরুনীর দাঁতগুলোর মতই সমান। মানুষ আইনের দৃষ্টিতে সর্বতোভাবে সমান।"[৫৯]

আইনের দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে কাউকে আইনের অধীন ও কাউকে আইনের উর্ধ্বে রাখাকে ধ্বংস ও কঠিন বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে মহানবী স. বলেন, "হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের পূর্বে এমন সব লোক ছিল, যাদের কোন অভিজাত ব্যক্তি চুরি করলে তারা তার উপর আইনের দণ্ড কার্যকর করত না। আর কোন নিম্ন শ্রেণীর লোক চুরি করলে তার উপর আইনের দন্ড কার্যকর করত"[৬০]

উম্মে সালমা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, "নিশ্চয় তোমরা আমার নিকট বিবাদ মীমাংসার জন্য উপস্থিত হয়ে থাক। অথচ আমিও একজন মানুষ। হয়ত তোমাদের এক পক্ষ তার যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে অপর পক্ষ অপেক্ষা অত্যন্ত বাকপটু হয়ে থাকবে। সুতরাং আমি তার পক্ষে রায় দিতে পারি এই মনে করে যে, সে সত্য বলেছে। সাবধান! তোমাদের কেউ যেন এরূপ না করে। এরূপ করলে সে যেন আগুনের টুকরো নিয়ে গেল।"[৬১]

মহানবী স.-এর ন্যায়বিচারের নমুনা

১. আলকামা ইবনে ওয়াইল র. হতে তার পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাযরামাওত এলাকার এক ব্যক্তি এবং কিনদা এলাকার এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট উপস্থিত হল। প্রথমে হাযরামী বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি আমার কিছু জমি জবরদখল করে রেখেছে। কিনদী বলল, তা আমার জমি, আমার দখলে আছে এবং তাতে তার কোন স্বত্ব নেই। নবী স.

---

[৫৮] আল-কুরতুবী, *রসূলুল্লাহ স.-এর বিচারালয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

[৫৯] গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ৩য় ভাগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

[৬০] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : কাতউস-সারেক আশ-শারিফ, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ১৮৬

[৬১] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : কিতাবুল মাযালিম, অনুচ্ছেদ : ইছমু মান খাসামা ফিল বাতিল, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ২০০২, খ. ২, পৃ. ১১৬

হাযরামীকে বললেন, তোমার কি সাক্ষী-প্রমাণ আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে তোমার প্রতিপক্ষের শপথের উপর তোমাকে নির্ভর করতে হবে। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকটি খারাপ প্রকৃতির, যে কোন ব্যাপারে শপথ করতে তার দ্বিধা নেই। কোন কিছুতেই তার ভয় নেই। তিনি বললেন, এছাড়া তোমার কোন বিকল্প পথও নেই। বর্ণনাকারী বলেন, কিনদী শপথ করতে অগ্রসর হলে রসূলুল্লাহ স. বললেন, সে যদি অন্যায়ভাবে প্রতিপক্ষের মাল আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা শপথ করে তাহলে সে আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, আল্লাহ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন।"[৬২]

২. রসূলুল্লাহ স. একদিন মসজিদে নববীতে বসা ছিলেন। এমন সময় এক যুবক এসে তাঁকে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি ইসলামের সব বিধানই মেনে চলতে প্রস্তুত। তবে আমি ব্যভিচার ছাড়তে পারব না। যুবকের কথা শুনে সাহাবা কিরাম স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। রসূলুল্লাহ স. তার প্রতি রাগ না করে বললেন, তুমি যার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে সে নিশ্চয় কারো মা বা বোন বা খালা, ফুফু নয় কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হলে কি এতে সম্মত হবে যে, কেউ তোমার বোনের সাথে ব্যভিচার করুক? এভাবে তার অন্যান্য মহিলা আত্মীয়ের কথা বললেন। সে প্রতিবারই বলল, না তা কি করে হয়, আমি কোন মতেই তা সহ্য করব না। এ সব কথা বলতে বলতে যুবক বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমার অন্তর হতে যেনার মত অপরাধ করার ইচ্ছা বা আগ্রহ দূর হয়ে গিয়েছে।"[৬৩]

৩. "তু'আয়মা উবায়রিক নামীয় একজন মুসলমান বর্ম চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হলে সে বর্মটি এক ইয়াহুদির বাড়ীতে পুঁতে রাখে। আর সে চিন্তা করে যে, যদি একান্তই ইয়াহুদির বাড়ী হতে বর্মটি উদ্ধার হয়ে যায় তাহলে এর দায়ভার ইয়াহুদীর উপর বর্তাবে, শেষে তাই হল। ইয়াহুদির বাড়ী হতে বর্মটি উদ্ধার হলে ইয়াহুদি কিছুই জানে না বলে অভিযোগ অস্বীকার করে। তু'আয়মা তখন বুঝাতে চেষ্টা করে যে, ইয়াহুদি আমার উপর দোষ চাপাচ্ছে, আসলে সেই চুরি করেছে। তুআয়মা মুসলমান হওয়ায় অন্য

---

[৬২] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী আল্লাল-বায়্যিনাতা আলাল মুদ্দাঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪০৩

[৬৩] অধ্যাপক এ টি এম মুসলেহ উদ্দিন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

মুসলমানরা তার প্রতি সভানুভূতিশীল ছিল। রসূলুল্লাহ স. বিষয়টি আদ্যোপান্ত জেনে মামলাটির ফায়সালা ঘোষণা করলেন। সাক্ষী-প্রমাণের ভিত্তিতে ইয়াহুদিকে খালাস দিলেন এবং তু'আয়মার বিপক্ষে রায় দিলেন"।[৬৪]

৪. মহানবী স. মদীনা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান হয়েও নিজেকে আইনের উর্ধ্বে রাখেন নি। বরং তিনি নিজেকে আইনের দিক দিয়ে সর্বসাধারণের স্তরে রেখেছেন। নবী করীম স. অসুস্থ হয়ে পড়লে একদিন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেন, "আমার নিকট কারো কিছু প্রাপ্য থাকলে তা যেন সে চেয়ে নেয়, কারো উপর অবিচার করে থাকলে সে যেন তার প্রতিশোধ আমার উপর নিয়ে নেয়। এ কথা শুনে সাওদা ইবনে কাইস রা. দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যখন তায়েফ থেকে উটের পিঠে চড়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, আপনার হাতে উট চালানোর চাবুক ছিল। আপনি চাবুক উর্ধ্বে তুললে আমার পেটে লেগে ছিল। তখন নবী করীম স. নিজের পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত করে দিয়ে বললেন, আজ তুমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। তখন সাওদা নবী করীম স.-এর পিঠে মুখ রাখার অনুমতি নিয়ে বললেন, আমি রসূলের উপর প্রতিশোধ নেয়ার স্থানের বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। রসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করলেন, হে সাওদা! তুমি প্রতিশোধ নিবে নাকি ক্ষমা করে দিবে? সাওদা বললেন, আমি বরং ক্ষমা করে দিচ্ছি।"[৬৫]

সাহাবাগণের ন্যায়বিচারের নমুনা

ইসলামের ইতিহাসে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ন্যায়বিচারের জন্য স্বর্ণযুগ হিসেবে খ্যাত। কারণ খুলাফায়ে রাশেদীন ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের মূর্ত প্রতীক। তাদের বিচারব্যবস্থার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১. উমর রা.-এর শাসন ও ইসলামের প্রচার-প্রসারে মুগ্ধ হয়ে খৃষ্টান রাজা জাবালা ইসলাম গ্রহণ করে। সে ইসলাম গ্রহণের পর উমর রা. কে সম্মান জানানোর জন্য মদীনায় রওয়ানা হয়। বিশাল বহরসহ আড়ম্বর পূর্ণভাবে সে মদীনা প্রবেশ করে। পথিমধ্যে বায়তুল্লাহ তাওয়াফকারী একজন হাজীর এক খণ্ড কাপড় ভুলবশত ঐ

---

[৬৪] গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ৩য় ভাগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
[৬৫] প্রাগুক্ত

রাজার গায়ে গিয়ে পড়ে। তাওয়াফকারী একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। রাজা ক্রোধান্বিত হয়ে লোকটিকে মুষ্ঠাঘাত করে। এতে তার দাঁত ভেঙ্গে যায়। উমর রা. এই ঘটনায় রাজা জাবালাকে ডেকে পাঠান। কারণ জানতে চাইলে সে জবাবে বলে, লোকটি আমাকে অপমান করেছে। পবিত্রস্থানের প্রতি তাকিয়ে তাকে সামান্য শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি, অন্যথায় তাকে অকুস্থলে হত্যা করতাম। উমর রা. তাকে বললেন, আমার আদালতে নালিশ এসেছে। সুতরাং যতক্ষণ লোকটির নিকট সে ক্ষমা চেয়ে অপরাধ হতে নিস্কৃতি না নিবে, ততক্ষণ তাকে দণ্ডের জন্য তৈরী থাকতে হবে। জাবালা বলল, আমি একজন রাজা, সে একজন সাধারণ মানুষ। উমর রা. বললেন, ইসলামে রাজা ও প্রজা সকলেই সমান এবং এই ধরনের আচরণে তার বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। লোকটি পরের দিন পর্যন্ত জাবালাকে সময়দানে সম্মত হলে উমর রা. সময় দান করলেন। জাবালা আদালতের কঠোর বিচারকার্য অনুমান করতে পেরে রাত্রে পলায়ন করল এবং পুনরায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করল।[৬৬]

২. একবার উবাই ইবনে কা'ব রা. যায়েদ ইবনে সাবিত রা. এর আদালতে খলীফা উমর রা. এর বিরুদ্ধে নালিশ করেন। উমর রা. আদালতে উপস্থিত হলে কাজী তাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য বসার আসন এগিয়ে দিলেন এবং খলীফাকে আসন গ্রহণের অনুরোধ করেন। খলীফা বিচারককে সম্বোধন করে বললেন, আদালতে একজন আসামীর প্রতি এভাবে সম্মান দেখানোই প্রথম অবিচার। তিনি বাদী উবাই ইবনে কাব রা.-এর পাশেই আসন গ্রহণ করেন। বিচারকার্য শুরু হলে উবাই ইবনে কাব এর অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন। আর এর স্বপক্ষে উবাই রা. কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি। তিনি উমর রা. কে কসম করার জন্য বললেন, বিচারক তখন খলীফার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এই দাবি প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেন। এতে উমর রা. রাগান্বিত হয়ে বললেন, আপনার চোখে যদি উমর ও অন্য সাধারণ মানুষ সমান না হয় তাহলে আপনি বিচারকের পদের জন্য উপযুক্ত নন।[৬৭]

৩. একবার আলী রা. এর একটি বর্ম হারিয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুজির পর তা এক ইয়াহুদীর নিকট পাওয়া যায়। আলী রা. নিজে বিচার না করে তার নিয়োগকৃত বিচারপতি শুরাইহ র.-এর আদালতে মামলা দায়ের করেন। নির্দিষ্ট দিনে আলী

---

[৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

[৬৭] A wred Gamil Mazzara Islam: *Democracy and sociolism*, Islamic Review, 1962, PP. 920

রা. সাক্ষী হিসাবে তাঁর পুত্র হাসান রা. ও তাঁর এক ভৃত্যকে হাযির করলেন। সাক্ষ্য-প্রমাণে ঘটনাটি সত্য প্রমাণিত হওয়ার পরও কাযী বিচারে ইয়াহুদীকে দায়ী করলেন না বরং তাকে নিস্কৃতি প্রদান করলেন। বিচারক সাক্ষীদ্বয়কে অযোগ্য ঘোষণা করলেন। আলী রা. জিজ্ঞেস করলেন, সাক্ষীদ্বয় কি সৎ ও ন্যায়পরায়ণ নয়? শুরাইহ র. বললেন, তাদের সততা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু পিতার অনুকূলে পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এই বলে তিনি খলিফার দায়ের করা মোকাদ্দমাটি খারিজ করে দিলেন।[৬৮]

৪. আবু বকর রা. খলীফা নির্বাচিত হয়ে সর্বপ্রথম ভাষণ দিলেন তাতে তিনি বললেন, আমার আনুগত্য তোমাদের উপর বাধ্যতামূলক। কিন্তু আমি যদি তোমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পথে পরিচালিত করতে ব্যর্থ হই, সেই দিন হতে তা আর তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক থাকবে না।[৬৯]

রসূলুল্লাহ স. ও খুলাফায়ে রাশেদীন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। একথা আজ স্বতঃসিদ্ধ, যে সমাজে ন্যায়বিচার বিদ্যমান থাকে না, সে সমাজ থেকে সভ্যতা ও সৌন্দর্য নির্বাসিত হয়।

উপসংহার

আলোকিত সমাজ গঠনে চাই আইনের শাসন। সমাজে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আইনের শাসম প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সর্বত্র আসবে কাংখিত শান্তি ও স্থিতিশীলতা। সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিচারককেই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। ইসলামের ন্যায়বিচার নীতি আইনের শাসনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মহানবী স. ও খুলাফায়ে রাশেদীন প্রত্যেকেই ছিলেন ন্যায়বিচারের মূর্তপ্রতীক। তাঁদের নির্দেশিত ন্যায়বিচারই পারে সমাজ থেকে সকল অশান্তি দূর করতে।

---

[৬৮] মুহাম্মদ ইবনে খালাফ আল-ওয়াকী, আখবারুল কুযাত, বৈরূত, তা.বি., পৃ. ১৪৯

[৬৯] গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ৩য় ভাগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮, সংখ্যা-২৯
জানুয়ারী-মার্চ : ২০১২

ইসলামী ব্যাংকিং ও করযে হাসানা : একটি প্রস্তাবনা

জাফর আহমাদ*[১]

[সারসংক্ষেপ : 'করযে হাসানা' আল-কুরআন বর্ণিত ইসলামের আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়। আল-কুরআনে এটিকে অত্যন্ত জোরালো ও ব্যতিক্রমধর্মী ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করা হয়েছে। যেহেতু ইসলাম মানবতার কল্যাণকামী একমাত্র জীবনব্যবস্থা, তাই সারা কুরআন জুড়ে মানুষের কল্যাণের কথাই বিবৃত হয়েছে। মানবতার কল্যাণের একটি বিশেষ পদ্ধতি হলো 'কারদ' বা 'কর্জ'। আর এই কর্জের উত্তম মর্যাদা বা উচ্চতর স্তর হলো 'করযে হাসানা'। ইসলামী জীবনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। আর অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে ব্যাংকিং সেক্টর। বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং এতটাই উৎকর্ষ লাভ করেছে যে, বিশ্বের দেশে দেশে ইসলামী ব্যাংক বা ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো খোলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয় তা হলো, 'মানবতার কল্যাণ ও আর্থসামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা'। মানবতার কল্যাণের জন্য ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, 'করযে হাসানা'। ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের বর্তমান করযে হাসানাকে আল-কুরআনে যে করযে হাসানার কথা বলা হয়েছে, সেই অনুযায়ী যথাসাধ্য আরো সম্প্রসারিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের চেষ্টা করতে পারে। করযে হাসানাকে ব্যাপক ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে এবং এ বিষয়ে জানানোর উদ্দেশ্যে করযে হাসানা-এর পরিচয়, আল-কুরআন ও আল-হাদীসে করযে হাসানা, করযে হাসানার অতিরিক্ত কিছু নেয়া, করযে হাসানার গুরুত্ব, লোন, ঋণ ও করযের উদ্দেশ্য, করযে হাসানা পরিশোধের নীতিমালা ও কিছু প্রস্তাব সম্পর্কে এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।]

করযে হাসানা-এর পরিচয়

কর্য শব্দের-এর পারিভাষিক অর্থ হলো দু'টি পক্ষ বা ব্যক্তির মধ্যে এমন লেনদেন সংগঠিত হওয়া যাতে এমন শর্ত থাকে যে, ঋণ বা কর্য হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ বা

---

১. প্রিন্সিপাল অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

দ্রব্য দেয়া হবে, সে পরিমাণ অর্থ বা দ্রব্য ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত দিবে। এর উচ্চতর পর্যায় হলো 'কর্যে হাসানা' অর্থাৎ উত্তম ঋণ, উত্তম লোন বা উত্তম কর্য ।

'কর্যে হাসানা' এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে "উত্তম ঋণ"। এর অর্থ হচ্ছে, এমন ঋণ, যা কেবল সৎকর্ম অনুষ্ঠানের প্রেরণায় চালিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাউকে দেয়া হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করলে আল্লাহ তাকে নিজের জন্য ঋণ বলে গণ্য করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কেবল আসলটি নয় বরং তার ওপর কয়েকগুণ বেশি দেয়ার ওয়াদা করেন। তবে এ জন্য শর্ত আরোপ করে বলেন, সেটি 'কর্যে হাসানা' অর্থাৎ এমন ঋণ হতে হবে যা দেয়ার পেছনে কোন হীন স্বার্থ থাকবে না বরং শুধুই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এ ঋণ দিতে হবে এবং তা এমন কাজে ব্যয় করতে হবে যা আল্লাহ পসন্দ করেন। করযের আরো কিছু পরিচয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

আল-কুরআন ও আল-হাদীসে করযে হাসানা

(ক) আল-কুরআনে: এই জাতীয় ঋণ প্রদানের জন্য আল-কুরআনে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "কে সে, যে আল্লাহকে করযে হাসানা (উত্তম ঋণ) দিবে? তাহলে তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বাড়িয়ে দিবেন। কমাবার ক্ষমতা আল্লাহর আছে, বাড়াবারও এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে"।[২]

"মহান আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের সংগে আছি, তোমরা যদি সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও, আমার রসূলগণে ঈমান আনো এবং তাদের সম্মান করো এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও; তাহলে আমি তোমাদের পাপগুলো মোচন করে দেবো এবং তোমাদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত। এরপরও কেউ কুফরী করলে, সে সরল পথ হারাবে"।[৩]

"কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে পারে? তাহলে তিনি তার জন্য তা বৃদ্ধি করে দিবেন। তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। আর সেদিন তুমি ঈমানদার নারী ও পুরুষদের দেখবে, তাদের 'নূর' তাদের সামনে ও ডান দিকে দৌড়াচ্ছে।

---

২. আল-কুরআন, ২:২৪৫ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

৩. আল-কুরআন, ৫:১২

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের যার পাদদেশে ঝরণাধারাসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই বড় সফলতা"।[৪]

"নিশ্চয় দানশীল পুরুষগণ ও দানশীল নারীগণ এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ বেশি এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার"।[৫]

"যদি তোমরা আল্লাহকে করযে হাসানা দাও তাহলে তিনি তোমাদেরকে তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তোমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করবেন আল্লাহ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল"।[৬]

"তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও;। যা কিছু ভালো ও কল্যাণ তোমরা নিজেদের জন্য অগ্রীম পাঠাবে, তা আল্লাহর নিকট সঞ্চিত ও মজুদ পাবে। এটি অতীব উত্তম এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর"।[৭]

(খ) আল-হাদীসে: সূরা বাকারার ২৪৫ নং আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আবু দারদা রা. রাসূলের স.-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল স.! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোন। আল্লাহ তাআলা কি আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছেন? তাঁর তো ঋণের প্রয়োজন নেই। রসূলুল্লাহ স. বললেন, আল্লাহ এর বদলে তোমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাতে চাচ্ছেন। আবু দারদা এ কথা শুনে বললেন, হে আল্লাহর রসূল স. হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়ালেন। আবু দারদা বললেন, আমি আমার দু'টি বাগানই আল্লাহকে ঋণ দিলাম। রসূলুল্লাহ স. বললেন, একটি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দাও এবং অন্যটি পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য রেখে দাও। আবু দারদা বললেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, এ দু'টির মধ্যে যে বাগানটি উত্তম-যাতে ছয়শত ফলবান বৃক্ষ রয়েছে, সেটা আমি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করলাম। রসূলুল্লাহ স. বললেন, এর বদলে আল্লাহ তোমাকে বেহেশত দান করবেন। আবু দারদা রা. বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বিষয়টি জানালেন। স্ত্রী তাঁর এ সৎকর্মের কথা শুনে অত্যন্ত খুশি

---

[৪]. আল-কুরআন, ৫৭ : ১১-১২ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ
يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

[৫]. আল-কুরআন, ৫৭ : ১৮
إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

[৬]. আল-কুরআন, ৬৪ : ১৭ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

[৭]. আল-কুরআন, ৭৩ :২০
وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا

হলেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, "খেজুরে পরিপূর্ণ অসংখ্য বৃক্ষ এবং প্রশস্ত অট্টালিকা আবু দারদার জন্য তৈরী হয়েছে"।[৮]

বারা ইবনে আযিব রা. বলেন, আমি নবী স. কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি দুধের জন্য মানীহা প্রদান করে অথবা টাকা-পয়সা ধার দেয় অথবা পথহারা ব্যক্তিকে সঠিক রাস্তা বলে দেয়, তার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে"।[৯]

নবী স. বলেছেন, আমি জান্নাতের দরজায় লিখিত দেখেছি যে, সদকা দিলে দশগুণ নেকী হয় আর কর্য দিলে আঠারগুণ নেকী হয়। আমি জিবরাঈল আ. কে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, কর্য বা ঋণ শুধু বিপদগ্রস্ত ও অভাবী লোকেরাই চায়। পক্ষান্তরে সদকা এরূপ নয়। তাই কর্জ দেয়ায় সওয়াব অনেক বেশী।[১০]

করযে হাসানা : অতিরিক্ত কিছু নেয়া যাবে কিনা

Loan ঋণ ও কর্য বিভিন্ন ভাষার সমার্থবোধক শব্দ। Loan ইংরেজী, ঋণ বাংলা ও কারদ্ বা কর্য আরবী ভাষার শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বর্তমান সমাজ অনেকটা বলপূর্বক শব্দগুলোর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবার্থ সৃষ্টি করেছে। কর্য প্রকৃত বা স্ব-ভাবার্থ নিয়ে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় অটুট আছে। কিন্তু একই অর্থবোধক ঋণ ও লোন শব্দের আসল রূপকে সুবিধাবাদী লোকেরা পরিবর্তন করে নিজেদের সুবিধা মতো ব্যবহার করছে। অর্থাৎ লোন ও ঋণের সাথে অতিরিক্ত কিছু যোগ করে (যাকে সুদ বলা হয়) মানুষকে শোষণ করছে। তাই লোন ও ঋণ বলতে মানুষ এখন সুদী লেনদেনই বুঝে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে Loan, ঋণ ও কর্য শব্দগুলো সম-পরিমাণ লেনদেনকেই বুঝায়। অতিরিক্ত কিছু দাবি করলে তাকে প্রকৃত অর্থে আর Loan, ঋণ ও কর্য বলা যায় না।

Loan শব্দটির অর্থ জানার জন্য বিভিন্ন ভাষার অভিধানের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। Oxford Dictionary-তে কাউকে লোন দেয়ার পর অতিরিক্ত কিছু নেয়ার কথা বলা হয়নি। এমনিভাবে বাংলা ও আরবী অভিধানেও লোন, ঋণ, কর্য ও

---

৮. হাদীসটি তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মদ শাফী র: অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, সউদী আরব কর্তৃক মুদ্রিত, পৃ.-১৩৫ থেকে নেয়া হয়েছে।

৯. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান* 'আবওয়াবুল বির্র ওয়াস সিলাহ' থেকে সংগৃহীত। হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম ইবনে মাজাহও বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু ঈসা র. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং আবু ইসহাক তালহা ইবনে মুসাররিফ সূত্রে গরীব। আমরা কেবল এই সূত্রেই হাদীসটি জানতে পেরেছি। মানসুর ইবনুল মুতামির ও শোবা র. তালহা ইবনে মুসাররিফ সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১০. হাদীসটি হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র.-এর *ইসলাহুল মুসলিমীন*,অনুবাদ এস.এম আবদুল গাফফার, ঢাকা : হাবিবিয়া বুক ডিপো, বাইতুল মোকাররম, পৃ. ৪১ থেকে গৃহীত।

ধার ইত্যাদি লেনদেনে কোথাও অতিরিক্ত নেয়ার কথা বলা হয়নি।[১১] সুতরাং Loan & Credit, কর্য, ঋণ একই অর্থের বিভিন্ন ভাষার শব্দ। কাজেই এগুলোর সাথে অতিরিক্ত কিছু যোগ করা সমীচীন নয়।

কাউকে ধার, কর্য, ঋণ বা লোন দেয়ার পর তার ওপর অতিরিক্ত কিছু নেয়া যাবে না। অতিরিক্ত অর্থ তো দূরের কথা এমনকি এতে অনার্থিক সুবিধা তথা বাহ্‌বা, কৃতিত্ব বা সুনাম অর্জনের নিয়তও কেউ করতে পারবে না। কারণ সমপরিমাণ ফেরত দেয়ার শর্তে কাউকে নির্ধারিত সময়ের জন্য কোন কিছু ব্যবহার বা উপকার লাভের সুযোগ দেয়ার নামই যেহেতু ঋণ, লোন, কর্য বা ধার, সেহেতু অতিরিক্ত কোন কিছুই আশা করা যাবে না। বরং এ ঋণ বা লোন আরো উত্তম ঋণে পরিণত হবে যদি খালেছ নিয়তে কোনরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে

---

[১১]. Loan, ঋণ, কর্য ও ধার শব্দগুলোর অর্থ জানার জন্য বিভিন্ন অভিধানের সাহায্য নেয়া হয়েছে। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় উল্লেখিত পরিভাষাগুলো ব্যবহার করে যে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে যা সুদ নামে অভিহিত, তা অনৈতিক। Oxford Dictionary, Edited by Oxford University Press ও Oxford Learner's Favorite Dictionary' Edited by Prof. Raihan Kawsar & Khairul Alam Monir, Published by Chowdhury & Son's, Dhaka, First Deluxe Edition January 2006 এ Loan শব্দটির অর্থ লিখা হয়েছে Money lent on interest বা a sum of money to be returnd normally with interest অর্থাৎ সুদে ধার দেয়া টাকা। আবার পরপরই লেখা হয়েছে Lend ও anything lent or permission to use or lend অর্থাৎ ধার দেয়া বা কোন জিনিস ধার দেয়া বা ব্যবহারের অনুমতি দেয়া। মজার ব্যাপার পরের অর্থেগুলোর সাথে Interest শব্দটি যোগ করা হয়নি। প্রকৃত পক্ষে প্রথম অর্থটি ভুল এবং পরের দুটি অর্থই সঠিক। বেশ কটি ইংলিশ অভিধানে এভাবেই শব্দটির অর্থ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য অভিধানে তথা আরবী ও বাংলা অভিধানে শব্দগুলোর অর্থের সাথে সুদ শব্দ যোগ করা হয়নি। যেমন 'বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' প্রধান সম্পাদক ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রথম প্রকাশ স্বরবর্ণ-ডিসেম্বর ১৯৭৪, ব্যঞ্জনবর্ণ জুন ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-এ ঋণ শব্দের অর্থ করা হয়েছে কর্জ, ধার ও দেনা। এখানে. ধার, দেনা বা কর্জের সাথে অতিরিক্ত কোন কিছুর যোগ করা হয়নি বা করার কথাও বলা হয়নি। এমনিভাবে 'সোনার বাংলা অভিধান' আবদুর রহিম সংকলিত, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ৪৯, বাংলাবাজার, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬ এ ঋণ ও কর্জ দুটি শব্দেরই অর্থ করা হয়েছে। পৃষ্ঠা ৩০৭ এ 'ঋণ' অর্থ ধার, কর্য একইভাবে পৃষ্ঠা ৩৫৭ এ কর্জ ও কর্জা এর অর্থ বলা হয়েছে ঋণ, দেনা বা ঋণ হিসাবে গৃহীত। এখানেও অতিরিক্ত বা সুদের উল্লেখ নেই। আরবী বাংলা অভিধান 'আল-ক্বামুসুল ওয়াজীয' ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, রিয়াদ প্রকাশনী-১৯৯৮ এর ৫৮২ নং পৃষ্ঠায় 'কারদ' বা কর্জ শব্দটির অর্থ লেখা হয়েছে ঋণ, কর্জ, ধার। এখানেও সুদ বা অতিরিক্ত কোন কিছু যোগ করা হয়নি। সুতরাং ইংলিশ অভিধানগুলোতে উল্লেখিত "Money lent on interest অর্থাৎ সুদে ধার দেয়া টাকা" অর্থটি আংশিক তথা 'সুদ' যোগ করাটা মারাত্মক ভুল ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

দেয়া হয়। যাতে কোন প্রকার প্রদর্শনেচ্ছা ও সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করার উদ্দেশ্য শামিল হতে না পারে। এটি দিয়ে কারো ওপর অনুগ্রহ দেখানো হবে না বা যাবে না। আল্লাহ বলেন,"যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না আল্লাহ তাদের ভালবাসেন না। শয়তান কারো সংগী হলে সে সংগী কত মন্দ"।[১২] আল্লাহ আরো বলেন, "হে ঈমানদারগণ! নিজেদের দানকৃত ধন-সম্পদ ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে দু:খ-কষ্ট দিয়ে ঐ ব্যক্তির মতো তোমাদের দানকে নষ্ট করো না, যে নিজের ধন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে"।[১৩]

মানুষের স্বভাব হলো সে ঋণ দিয়ে কিছু পেতে চায়। তাই এরূপ ঋণদান প্রসংগে আল্লাহ তাআলার দু'টি ওয়াদা রয়েছে। একটি হলো, তিনি এটি কয়েকগুণ বেশী করে ফিরিয়ে দিবেন। আর দ্বিতীয়টি হলো, তিনি সে জন্য নিজের তরফ থেকে অতীব উত্তম প্রতিফলও দান করবেন।

করযে হাসানার গুরুত্ব

সমাজের অভাবগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত জনগণের নানা কারণে সাময়িকভাবে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তা ফিরিয়ে দেয়ার সামর্থ্য নাও হতে পারে। হঠাৎ করে প্রয়োজন দেখা দেয়ার প্রয়োজন পূরণের জন্য যে টাকার দরকার হয়ে পড়ে, তার ব্যবস্থা না হলে বহু মানুষকেই কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়ে যেতে হয়। বহু ব্যক্তি বা বহু পরিবারেরই এ কারণে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এটি সামাজিক সুস্থতা ও জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার পরিপন্থী এবং কুরআনী আদর্শেরও খেলাফ।

এ পরিস্থিতিতে সমাজকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিনা সুদে কোনরূপ অতিরিক্ত পাওয়ার আশা ব্যতিরেকে 'করযে হাসানা' (উত্তম ঋণ) প্রদান করতে। করযে হাসানার গুরুত্ব অনুধাবন করতে গিয়ে প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মুহাম্মদ আকরাম খান বলেন, 'করযে হাসানা হচ্ছে সাংসারিক, পারিবারিক, স্থানীয় ও জাতীয় ভিত্তিক তথা বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নিরাপত্তার সামগ্রিক পরিকল্পনার একটি উপাদান। পরিবারের সদস্যদের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে, অভাবী ও বিপদগ্রস্ত সদস্যদেরকে করযে হাসানা প্রদান করা। যদি তাদের পক্ষে এটা দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে তাদের পাড়া-প্রতিবেশীদের সামাজিক দায়িত্ব হচ্ছে, এ ধরনের অভাবীদেরকে এই প্রকারের

---

[১২] আল-কুরআন, ৪ : ৩৮

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَـاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاء قِرِينًا

[১৩] আল-কুরআন, ২ : ২৬৪

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ

ঋণ প্রদান করা। অন্যদিকে পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও পাড়া-প্রতিবেশী যদি তাদেরকে সাহায্য না করে, তাহলে সরকারকেই সামগ্রিকভাবে এই ধরনের সুবিধা প্রদানে এগিয়ে আসতে হবে। যে ভাবেই হোক, করযে হাসানাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে, যাতে কোন ব্যক্তি যেন করযে হাসানা না পাওয়ার কারণে কারো শোষণের শিকারে পরিণত না হয়।[১৪]

বিশিষ্ট দার্শনিক মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম বলেছেন, "কুরআনের ঘোষণাবলী এ পর্যায়ে পঠনীয় যে, কোন ব্যক্তির এরূপ প্রয়োজন দেখা দিলে কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে, সমাজের যে লোকেরই সাধ্য আছে, সে যেন সাময়িক ঋণ দিয়ে তারই অসুবিধায় পড়া ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে"।[১৫]

সূরা বাকারার ২৪৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "কোন লোক আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে প্রস্তুত? তাহলে তিনি তাকে বহুগুণ বৃদ্ধিসহ ফিরিয়ে দেবেন। আসলে আল্লাহ তাআলাই সংকীর্ণ করেন এবং প্রশস্ত করেন। তাঁরই দিকে তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" এ আয়াতটিতে প্রথমত আল্লাহ নিজেই ঋণ চেয়েছেন। কাদের জন্য? সমাজের যে সব লোকের সাময়িক ঋণের প্রয়োজন তাদের জন্য। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, সমাজে এমন লোক অবশ্যই থাকবে, যাদের সাময়িক ঋণের প্রয়োজন হবে। যাতে মানুষের মধ্যে এই কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয় যে, তারা সেখানে এমন এক সমাজ কায়েম করবে যেখানে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হবে। আর এই ভ্রাতৃত্বের টানে একে অন্যের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য নিজেদের দায়িত্ব রয়েছে বলে মনে করবে। কারণ এটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, বিপদগ্রস্ত লোকগুলোর পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলা নিজেই ঋণের প্রার্থী হয়েছেন এবং ঋণদাতা ঋণ দিয়ে বাড়তি যা পেতে চায়, তা তিনি নিজে দিয়ে দিবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি ঋণপ্রার্থী তো এমনিই ঠেকায় পড়েছে, তার কাছে বাড়তি কিছু চাওয়া মানে বিপদগ্রস্তকে আরো বেশী বিপদের দিকে ঠেলে দেয়া।

তাই 'করযে হাসানা'-এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এ কারণে আল্লাহ ঋণদানের ব্যাপারটিকে প্রশস্ততর বিবেচনা করার সুযোগ করে দিয়েছেন সূরা মায়েদার ১২নং আয়াতে: "তোমরা যদি সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন, তাঁদের সম্মান কর এবং আল্লাহকে করযে হাসানা দাও, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের থেকে তোমাদের দোষ-ত্রুটি-গুণাহ অসুবিধাসমূহ

---

[১৪]. অধ্যাপক মুহাম্মদ আকরাম খান, *মহানবীর স. অর্থনৈতিক শিক্ষা*, অনুবাদ : মুহাম্মদ মূসা, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৮, পৃ. ২২৩

[১৫]. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ. ৬১

দূর করে দেব এবং তোমাদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার পাদদেশে নদী প্রবাহমান।" এ আয়াতে নামায, যাকাত ও রসূলগণের প্রতি ঈমান এবং তাদের সাহায্য সহায়তা করার মতো ইসলামের মৌলিক কাজের সাথে 'করযে হাসানা' কে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন, হঠাৎ বিপদে পতিত ব্যক্তিকে বিপদমুক্তির জন্য করযে হাসানা প্রদান করা হলে তা আল্লাহর পথে দান হিসাবে গণ্য হবে। আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ ব্যয় করাকে ঋণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ঋণ গ্রহীতা হলেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তবে এই ঋণ অবশ্যি 'উত্তম ঋণ' হতে হবে। অর্থাৎ বৈধ উপায়ে সংগৃহিত অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে এবং আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও সৎ সংকল্প সহকারে ব্যয় করতে হবে।

সুতরাং এটি ঐচ্ছিক কাজ হিসাবে গুরুত্ব দেয়ার অবকাশ নেই। ইসলামের বড় বড় মৌলিক কাজের মতই তা অত্যধিক গুরুত্বের দাবি রাখে। একটি ইসলামী সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, সেই সমাজের অধিবাসীরা পারস্পরিক অর্থনৈতিক বন্ধু। সমাজের প্রয়োজনে তারা একে অপরকে বিপদে-আপদে 'করযে হাসানা' দিবে। যদি কোন সমাজে এর অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়, বুঝতে হবে সেই সমাজে বিকৃতি অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ সেই সমাজ থেকে দূর হয়ে গেছে। অথচ সমাজ জীবনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব। এই মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া কোন সমাজই টিকে থাকতে পারে না। মানব সমাজের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে একটি কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে কর্য, ঋণ, ধার বা লোনের প্রচলন মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে শুরু হয়েছে। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফলে মানুষের মন-মনন অত্যন্ত কঠিন রূপ ধারণ করলেও আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নিঃস্বার্থভাবে কর্য, ঋণ বা লোন বহুলাংশে কমেছে বটে, কিন্তু নিঃশেষ হয়ে যায়নি। এখনো একে অপরের কল্যাণার্থে এ ধরনের লেনদেন করতে দেখা যায়। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। আর এ জন্য সুদই শতভাগ দায়ী। সুদ মানুষকে এতটাই স্বার্থপর হিসাবে গড়ে তোলে যে, তাতে ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পূর্ণভাবে উবে যায়। সুদভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় স্বার্থ ছাড়া কেউ কাউকে কর্য, ঋণ বা লোন দেয়ার চিন্তাই করতে পারে না। এ স্বার্থ আর্থিক অনার্থিক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এমনকি নিজেদের আপন কোন লোককেও চরম বিপদের সময়ে বিনা সুদে বা কোন স্বার্থ ছাড়া ধার কর্য বা লোন দিতে চায় না।

যেহেতু সুদের নিজস্ব ও বৈধ কোন অবস্থান নেই, কর্য, ঋণ বা লোনের মত একটি পবিত্রতম পরিভাষার সাথে যুক্ত হয়ে তার অবৈধ অবস্থান সৃষ্টি করেছে, তাই সমাজ সভ্যতায় তার উপস্থিতি কোনক্রমেই কাম্য নয়। কারণ মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে

পারস্পরিক নির্ভরশীলতা , সহযোগিতা ও কল্যাণকামী সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতা ফুলে ফলে সমাজকে সুশোভিত করে। আর এ জন্যই ঋণ, লোন বা কর্য নামক পরিভাষাগুলো ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে।

Loan ঋণ ও কর্যের উদ্দেশ্য

Loan ঋণ ও কর্য ইত্যাদি শব্দগুলো সমপরিমাণ লেনদেন বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং প্রচলিত ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এ শব্দগুলোকে সুদী লেনদেনে ব্যবহার করা অনৈতিক। আজও আমাদের সমাজের মানুষ কর্য বলতে বুঝে কারো আপদ বিপদে একমাত্র তার উপকারের নিমিত্তে কোন কিছু ধার দেয়া। আমাদের মা বোনেরা সামান্য লবণ থেকে নিয়ে অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস প্রতিবেশীর কাছ থেকে কর্য নেয় এবং যে পরিমাণ গ্রহণ করে, ঠিক সে পরিমাণই ফেরৎ দেয়। ঋণ বা কর্য এগুলোর প্রচলনই হয়েছে প্রতিবেশী প্রতিবেশীর মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য। ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদের মালিক আল্লাহ্ তাআলা, পৃথিবীর মানুষ এর ট্রাস্ট্রি বা আমানতদার মাত্র। কাজেই আল্লাহ তাআলার এ সম্পদ হতে মানুষ সমান ভাবে উপকৃত হবে। পুজিঁবাদ ও সমাজতন্ত্র নামক দু'টি প্রান্তিক মতবাদের মাঝে ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ ও সুষম অর্থনীতির কথা বলে। ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থকে একই ভাবে দেখে। এক দিকে ব্যক্তিকে তার সমৃদ্ধির উৎসাহ দেয়, অন্য দিকে ব্যক্তি সমাজের অংশ হিসাবে সমাজের অন্যান্যদের সুখ ও সমৃদ্ধি সাধনের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। আর এটিই ভ্রার্তৃত্ববোধ। ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতিফলন তখনি ঘটে যখন আপদে বিপদে একে অপরকে নিঃস্বার্থভাবে কর্য, ঋণ বা লোন দেয়। কিন্তু মানুষের স্বভাব প্রকৃতি আজ এমন দয়ামায়াহীন যে, ভ্রাতৃত্ববোধ বলতে কোন কিছুরই পরোয়া করে না। এমনকি গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রের ছোট নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসটি কিছুক্ষণের জন্য অন্যকে দিতেও কৃপণতা করে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

"তারপর সেই নামাযীদের জন্য ধ্বংস, যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে গাফলতি করে, যারা লোক দেখানোর জন্য কাজ করে এবং মামুলী প্রয়োজনের জিনিসপত্র দেয়া থেকে বিরত থাকে"।[১৬] এ সূরার শেষের আয়াতের ব্যাখায় বিভিন্ন হাদীস বিশারদ, হাদীস বর্ণনাকারী ও মুফাসসিরগণ যাকাত থেকে নিয়ে মানুষের গৃহস্থালীর কাজে লাগে এ ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন, হাড়ি-পাতিল, বালতী, দা-কুড়াল, দাড়িপাল্লা, লবণ, পানি, আগুন, দেয়াশলাই ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন।

---

[১৬] আল-কুরআন, ১০৭ : ৪-৭

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

আমরা আমাদের সমাজে এ ধরনের হীন মনোবৃত্তির কিছু কিছু কৃপণ বলে পরিচিত ব্যক্তিদের দেখি, তারা এ ধরনের ক্ষুদ্র জিনিস ও তার প্রতিবেশীকে সামান্য সময়ের জন্যও ধার দিতে চায় না।

মানুষ সামাজিক জীব। তাই সমাজের প্রতিটি মানুষই পরস্পর নির্ভরশীল। এ নির্ভরশীলতার ভিত্তি হলো সামাজিক ভ্রাতৃত্ব। এ জন্য কারো বাড়িতে মেহমান এলে প্রতিবেশীর কাছে বিছানা-বালিশ চাইবে, প্রতিবেশীর চুলোয় একটু রান্না-বান্না করে নিবে, এক চিমটি লবণ বা চিনি চাইবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কৃপণেরা তাও দিতে চায় না। সামাজিক বন্ধন বা ভ্রাতৃত্ব এদের কাছে মূল্যহীন। আর এ ধরনের স্বভাব সৃষ্টির পিছনে ব্যক্তি স্বার্থ চিন্তাই শতভাগ দায়ী। একজন ইসলামী চিন্তাবিদ বলেছেন, ব্যক্তি স্বার্থ ও অর্থ সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা থেকে মানুষ ব্যবসায়ের বিভিন্ন পর্যায় পর্যন্ত সমগ্র মানসিক কর্মকান্ড স্বার্থান্ধতা, কার্পণ্য, সংকীর্ণতা, মানসিক কাঠিন্য ও অর্থপূজার পারদর্শিতার প্রভাবাধীনে পরিচালিত হয়"।[১৭] সুদের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষের স্বার্থপরতার কারণেই সুদের প্রচলন হয়েছে। সুদের মাধ্যমে নির্ধারিত ও নিশ্চিত আয় পাবার লোভ মানুষের বিচার-বিবেচনা, আচার-আচরণ, আবেগ-অনুভূতি, এমনকি বিবেক পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলে। যারা সুদ খায় তাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে স্বার্থপরতা, লোভ ও কৃপণতা এমনভাবে বিকাশ লাভ করে যে, তারা সমাজের অন্যান্য লোকের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এ অবস্থা ধীরে ধীরে গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে তখন দয়া-মায়া, সহানুভূতি, সহমর্মিতা অনেকাংশে বিলোপ হয়ে যায়। ফলে সে সমাজে সুদ দিতে না পারলে এক সময় মৃত সন্তানের লাশ দাফন করার জন্য জরুরী ঋণ পাওয়া যাবে না।[১৮]

কর্য, ঋণ, লোন, ধার সমাজের ভ্রাতৃত্বকে মজবুত করে

কর্য, ঋণ ও লোন ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির অন্যতম কার্যকর ব্যবস্থা। প্রতিবেশীদের সহযোগিতা ছাড়া মানুষ সমাজে বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না। অস্তিত্বের প্রয়োজনে মানুষকে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হয়। এ জন্য কুরআন ও হাদীসে প্রতিবেশীদের সম্প্রীতি, সহ-অবস্থান, ভ্রাতৃত্ববোধ, সমাজবদ্ধতা বা দলীয় জীবন ও ঐক্যের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ স. বহুবার প্রতিবেশীদের সাথে সৌজন্য প্রদর্শনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

---

[১৭]. সাইয়েদ আবুল আলা, *সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*, অনুবাদঃ আব্বাস আলী খান, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৯, পৃ. ৫৫

[১৮]. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯২, পৃ. ১৫

রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা প্রতিবেশীদের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে এত বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন যে, মাঝে মধ্যে আমার মনে হয়েছে প্রতিবেশীদের হয়ত আমার উত্তরাধিকারীর মর্যাদা দেয়া হতে পারে।" একটি সুস্থ সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো ভ্রার্তৃত্ববোধ। এটি ছাড়া কখনো একটি সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠতে পারে না। আর ইসলামই এ ভ্রার্তৃত্ব সৃষ্টির লক্ষে যথোপযুক্ত কর্মসূচি দিয়েছে। মুসলমানদের আল্লাহর পথে দান করার সাধারণ নির্দেশ দিয়ে তাদের অর্থসম্পদে সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকার কায়েম করেছে। এর অর্থ হচ্ছে মুসলমানকে দানশীল, উদার হৃদয়, সহানুভূতিশীল ও মানব-দরদী হতে হবে। স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতা পরিহার করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিটি সৎকাজে এবং ইসলাম ও সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ব্যয় করতে হবে। ইসলাম শিক্ষা ও অনুশীলন এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সামষ্টিক পরিবেশ কায়েমের মাধ্যমে প্রতিটি মুসলমানের মধ্যে এ নৈতিক চেতনা সৃষ্টি করতে চায়। এ ভাবে কোন প্রকার বল প্রয়োগ ছাড়াই হৃদয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় মানুষ সমাজ কল্যাণে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পরস্পরকে ঋণ দেয়া অপরিহার্য কর্তব্যরূপে বিবেচিত। এ ধরনের কর্তব্যবোধ একটি সমাজের সুস্থতার পরিচায়ক। যদি কোন সমাজে এর অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় তবে বুঝতে হবে সেখানকার পরিবেশ বিকৃত হয়ে গেছে এবং সেখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ইবাদাতগুলোর মধ্যে শিথিলতা দেখা দিয়েছে।

করযে হাসানা পরিশোধের ইসলামী নীতিমালা

এ ধরনের ঋণ ফেরত পাওয়ার প্রশ্নটিও অত্যন্ত জটিল। কেননা যে লোক অনন্যোপায় হয়ে ঋণ গ্রহণ করে তার ঋণ ফেরত দেয়ার জন্য যে সচ্ছলতা প্রয়োজন, নির্ধারিত সময়সীমারা মধ্যে সে হয়তো আদায় করতে পারবে না। এরূপ অবস্থায় ঋণদাতার নীতি কি হবে তাও আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন। "ঋণ গ্রহীতা যদি দারিদ্র্য সংকটে নিমজ্জিত হয় তাহলে তার পক্ষে ঋণ ফেরত দেয়ার সামর্থ্য হওয়ার সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়া বাঞ্ছনীয়। তোমাদের পক্ষে সবচাইতে কল্যাণকর হচ্ছে ঋণ বাবদ দেয়া সম্পদ তাকে দান করে দেয়া, অবশ্য তোমরা যদি জানো"।[১৬]

এ আয়াতটি থেকে শরীয়তের এই বিধান গৃহীত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে আদালত তার ঋণদাতাদের বাধ্য করবে, যাতে তারা

---

[১৬]. আল-কুরআন, ২ : ২৮০

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

তাকে সময় দেয় এবং কোন কোন অবস্থায় আদালত তার সমস্ত দেনা বা তার আংশিক মাফ করে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ "এক ব্যক্তির ব্যবসায়ে লোকসান হতে থাকে। তার ওপর দেনার বোঝা বেড়ে যায়। ব্যাপারটি নবী স. পর্যন্ত গড়ায়। তিনি লোকদের কাছে ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করার আবেদন জানান। অনেকে তাকে আর্থিক সাহায্য দান করে কিন্তু এরপরও তার দেনা পরিশোধ হয় না। তখন নবী সঃ তার ঋণদাতাদের বলেন, যা কিছু তোমরা পেয়েছো তাই নিয়ে তাকে রেহাই দাও। এর বেশী তার কাছ থেকে তোমাদের জন্য আদায় করিয়ে দেয়া সম্ভব নয়"। ফকীহগণ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এক ব্যক্তির থাকার ঘর, খাবার বাসনপত্র, পরার কাপড়-চোপড় এবং যে যন্ত্রপাতি দিয়ে সে রুজি-রোজগার করে, সেগুলো কোন অবস্থাতেই ক্রোক করা যেতে পারে না।[২০]

রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "যে লোক কোন দারিদ্র্য সংকটাপন্ন ঋণী ব্যক্তিকে অবকাশ দেবে, অবকাশের প্রত্যেকটি দিনে তার জন্য একটি করে সাদকা হবে"। তিনি আরো বলেছেন, "যে লোক এ আশায় সন্তুষ্ট যে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনে অসংখ্য প্রকারের কষ্ট থেকে মুক্তি দান করুন, তার কর্তব্য হচ্ছে দারিদ্র্যক্লিষ্ট ঋণী ব্যক্তির ঋণ ফেরত দিতে অবকাশ দেয়া অথবা তার থেকে তা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা"।[২১]

করযে হাসানা-এর প্রচলন না থাকার পরিণাম

হঠাৎ বিপদে নিপতিত ব্যক্তিকে উদ্ধারের নিমিত্তে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাউকে না কাউকে অবশ্যই করযে হাসানা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় সকলকেই গুনাহগার হতে হবে। এটি হচ্ছে সাংসারিক, পারিবারিক, স্থানীয় ও জাতীয় ভিত্তিক তথা বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নিরাপত্তার সামগ্রিক পরিকল্পনার একটি উপাদান।[২২] প্রথমত পরিবার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে করযে হাসানা দিবে। তা সম্ভব না হলে সমাজ, সমাজ যদি অপারগ হয় বা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে দেশের সরকারকেই করযে হাসানার ব্যবস্থা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, সরকার বিপদগ্রস্তকে উদ্ধার করার সাথে সাথে এই খোঁজ-খবরও নিতে হবে যে, কেন সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকেরা করযে হাসানা দিয়ে এ ব্যক্তিকে সাহায্য করেনি। যদি ব্যাপারটি এমন হয়ে থাকে যে, সাধ্য থাকা সত্ত্বেও তারা করযে হাসানা দিয়ে বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেনি, তাহলে সরকারকে বুঝতে

---

২০. সাইয়েদ আবুল আলা, *তাফহীমুল কুরআন,* অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৪, খ. ১, পৃ. ৩৪২

২১. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪ সেখানে তিনি আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "যে লোক কোন গরিব সংকাটাপন্ন ঋণী ব্যক্তিকে অবকাশ দেবে, অবকাশের প্রত্যেকটি দিন তার জন্য একটি করে সদকা হবে।

২২. অধ্যাপক মুহাম্মদ আকরাম খান, *মহানবীর স. অর্থনৈতিক শিক্ষা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

হবে যে, সেখানকার ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে এবং মানুষের ঈমান-আমলের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে।

উপরে আল-কুরআন ও আল-হাদীসে করযে হাসানা' শিরোনামে যে কয়টি আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিটি আয়াতের শেষের দিকে করযে হাসানা না দেয়ার পরিনাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। এখানে সূরা বাকারা ও মায়েদার দু'টি আয়াত নং যথাক্রমে ২৪৫ ও ১২ পুনরায় উল্লেখ করা হলো, "কে সে, যে আল্লাহকে করযে হাসানা (উত্তম ঋণ) দিবে? তিনি তার জন্য তা বহু গুণে বাড়িয়ে দিবেন। কমাবার ক্ষমতা আল্লাহর আছে, বাড়াবারও এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে"।

"আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে থাকো, নিশ্চিত বিশ্বাস করো আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপগুলো মোচন করে দেবো এবং তোমাদের এমন সব বাগানে মধ্যে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে। কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি কুফরী নীতি অবলম্বন করবে, সে আসলে 'সাওয়া-উস-সাবীল' তথা সরল সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছে"।

এ আয়াতের ব্যাখায় বলা হয়েছে, "আজ তোমাদের সচ্ছলতা আছে বলেই তো ঠেকায় পড়া লোকগুলো তোমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছে। কাল এ সচ্ছলতা তোমাদের নাও থাকতে পারে। আর ঐ সচ্ছলতা তো আল্লাহই দিয়েছেন। কাল তিনি তা তোমাদের কাছ থেকে কেড়েও নিতে পারেন। মনে রাখা প্রয়োজন, শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকে অন্য কথায় ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতা উভয়কেই আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে। এ পর্যায়ে তোমরা কি সিদ্ধান্ত নিলে সে বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে"।[২৩]

আয়াতে উল্লেখিত 'সাওয়া-উস-সাবিল' শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যে সমাজে করযে হাসানার পদ্ধতি অবশিষ্ট নেই সেখানকার মানুষগুলো সরল-সঠিক পথ থেকে ছিটকে পড়েছে। তাদের সামগ্রিক চরিত্রে বিকৃতি ঘটেছে। সৎকর্মের প্রতিটি অধ্যায়ে শিথিলতা দেখা দিয়েছে। সাওয়া-উস-সাবিল পেয়েও আবার তা হারিয়ে ফেলেছে এবং ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছে। 'সাওয়া-উস-সাবীল' শব্দটির গভীর তাৎপর্য রয়েছে। যে সমাজে করযে হাসানার মতো কল্যাণমুখী ব্যবস্থা চালু নেই, সেই সমাজের অধিবাসীরা শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে কৃপণই নয় বরং সাওয়া-উস-সাবিল থেকে তারা দূরে চলে গেছে। তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আমল-আখলাক ও বিশ্বাস থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিকৃতি দেখা দিয়েছে

---

২৩. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

এবং এ বিকৃতি সমাজ ও রাষ্ট্রকেও আক্রান্ত করেছে। মানুষের দয়া-মায়া, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামজিক দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে।

ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রতি একটি প্রস্তাব

'করযে হাসানা' মূলত সমাজের ধনী লোকদের ওপরই বর্তায়। ব্যাংক যেহেতু মানুষের টাকা নিয়ে ব্যাংকিং লেনদেন পরিচালনা করে, সেহেতু এ ধরনের ঋণ দেয়ার সুযোগ কোথায়? কোন কোন ইসলামী ব্যাংক কর্তব্যের টানে গ্রাহকদের মেয়াদী আমানতের বিপরীতে করযে হাসানা দিয়ে থাকে। তাছাড়া তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর বিপরীতেও করযে হাসানা দেয়। কিন্তু এসব উদ্যোগ মূলত আল-কুরআনের করযে হাসানার উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে না। তাই ইসলামী ব্যাংকসমূহকে নিম্নলিখিত ভাবে করযে হাসানা চালু করার প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে।

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান: ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের রেগুলেটরী ব্যাংক তথা সংশ্লিষ্ট দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে যথাযথ অনুমতি নিয়ে প্রচলিত তাদের অন্যান্য বিভাগের পাশাপাশি 'করযে হাসানা' নামে একটি বিশেষ বিভাগ চালু করতে পারে।

(খ) তহবিল গঠন : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ তাদের নিয়মিত কার্যাবলীর মধ্যে ইসলামী শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণমূলক কাজ 'ওয়াকফ' একাউন্ট চালু করেছে। আল-কুরআনের দৃষ্টিতে 'করযে হাসানা'-এর গুরুত্ব 'ওয়াকফ' স্কীম থেকে অনেক বেশী। তাই করযে হাসানার তহবিল গঠন করার জন্য ওয়াকফ-এর মতই জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। ওয়াকফ একাউন্টের মুনাফাও এ ফান্ডের উৎস হতে পারে। তাছাড়া ব্যাংকের বিভিন্ন উৎস তথা প্রতি বছর ব্যাংকের লাভের একটি অংশ এবং ব্যাংকের মালিক বা শেয়ার হোল্ডারদের থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রদেয় চাঁদা, ব্যাংকের বড় বড় সঞ্চয়ী ও বিনিয়োগ গ্রাহক ও ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে এ তহবিলে অনুদান দিতে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এমনকি যাকাতের টাকাও এর উৎস হতে পারে। কারণ যাকাতের আটটি খাতের একটি হলো 'ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণভার মুক্ত করা'। ইসলামী নির্দেশনার আলোকে যেহেতু করযে হাসানা পরিবার না পারলে সমাজ, সমাজ না পারলে শেষাবধি সরকারের ওপর হঠাৎ বিপদে নিপতিত ব্যক্তিকে উদ্ধারের দায়িত্ব বর্তায়, তাই সরকারকেও এ ফান্ডের যোগানের জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।

(গ) করয বিতরণ ও আদায় প্রক্রিয়া: করযে হাসানা ও ইনফাক দু'টি ভিন্ন বিষয়। নিজের পরিবারের জন্য এবং সেই সাথে দরিদ্র ও অভাবীদের জন্য অর্থ ব্যয় করাকে 'ইনফাক' বলে। আর করযে হাসানা হচ্ছে এমন এক প্রকার ঋণ যা গ্রহীতার নিকট থেকে আদায় যোগ্য। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের বিনিয়োগের কার্যক্রমের ন্যায় করযে হাসানার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবে। অর্থাৎ করযে হাসানা পাওয়ার মতো প্রকৃত গ্রহীতা বাছাই করা, প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সম্পাদন করা, ঋণ

বিতরণ ও আদায় সব কিছুই নিয়মিত বিনিয়োগের প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হবে। করযে হাসানা প্রার্থী বাছাই, ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মুহাম্মদ আকরাম খান কিছু আচরণবিধি নির্ধারণ করেছেন।

এক. নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঋণ চাওয়া যাবে না। আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার জন্য ঋণ চাওয়া যাবে না। এ ধরনের ঋণ সেই চাইতে পারে যে জীবন ধারণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে অক্ষম ।

দুই. করযে হাসানা আদান-প্রদানের বিষয়টি সাক্ষীদের সামনে লিখিতভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তিন. যিনি করযে হাসানা দিবেন তিনি গ্রহীতার নিকট থেকে রাহন (বন্ধক) চাইতে পারেন। ঋণ গ্রহীতাকে নির্ধারিত তারিখে দ্রুত পরিশোধের নির্দেশ দেয়া যেতে পারে।

চার. সে নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই তা পরিশোধ করতে সক্ষম হলে অবশ্যই তৎক্ষণাৎ পরিশোধ করবে। নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করা তার জন্য অপরিহার্য নয়।

পাঁচ. ঋণ দাতাকে ঋণ গ্রহীতার সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় ঋণ আদায়ের জন্য গ্রহীতাকে তাড়া করে বেড়ানো উচিৎ নয়। ঋণ আদায়ে কঠোরতা বা অসৌজন্যমূলক পন্থার আশ্রয় নিয়ে ঋণ গ্রহীতার মর্যাদা ক্ষুন্ন করা ঠিক নয়।

ছয়. ঋণ গ্রহীতা মেয়াদ বৃদ্ধির অনুরোধ করলে উদারতার সাথে তা অনুমোদন করা উচিত।

সাত. ঋণ গ্রহীতা পুরো ঋণ বা তার অংশবিশেষ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তা ঋণদাতার মওকুফ করে দেয়া উচিৎ। ঋণদাতা যদি তার দেয়া ঋণ মওকুফ করতে না চান, অথচ ঋণগ্রহীতা তা পরিশোধ করতেও অক্ষম হয়, সেক্ষেত্রে সরকার যাকাত তহবিল থেকে তাকে সাহায্য করবে।[২৪]

উপকারিতা

এ ঋণ সমাজের হঠাৎ বিপদে নিপতিত ব্যক্তিদের শুধু উপকারেই আসবে না, বরং এটি বাস্তবায়নের ফলে সার্বিকভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ বয়ে আনবে। একজন অর্থনীতিবিদ বলেছেন, "করযে হাসানা সমাজে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি এবং বিত্তহীনদের দক্ষ ও যোগ্য লোকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারে। ইসলামী সমাজের এ অপরিহার্য বিধানটি এদেশে অনুপস্থিত। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও শ্রীলংকাতেও মসজিদভিত্তিক করযে হাসানা প্রদান ও সোসাইটি ভিত্তিক মুদারাবাহ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই এদুটি দেশে মুসলমানরা কিছুটা হলেও

---

[২৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ পাচ্ছে"।[২৫] আমাদের সমাজে অসংখ্য মানুষ হঠাৎ বিপদ থেকে আপাতত মুক্ত হওয়ার জন্য সমাজের বিত্তশালীদের কাছ থেকে সুদে ঋণ গ্রহণ করে বিপদ থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু সামনে তার জন্য আরো বড় বিপদ অপেক্ষা করে। সুদে আসলে মহাজনের পাওনা পরিশোধ করতে গিয়ে তাকে শেষাবধি সহায়-সম্পদ এমনকি অনেককে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হতে হয়। এ লেনদেনের কারণে কত যে সামাজিক অনাচার ও দুরাচার সৃষ্টি হয় তার কি কোন ইয়ত্তা আছে? মারামারি,কাটাকাটি ও খুনখারাবির মতোও অনেক ঘটনা ঘটে থাকে। সুদ ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রধান লক্ষ। তাই ইসলামী ব্যাংকগুলো যদি করযে হাসানার মতো ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধানটি চালু করে, তবে এর মাধ্যমে একদিকে হঠাৎ বিপদে পড়া লোকজন মুক্ত হতে পারবে, অন্যদিকে সুদের অভিশাপ থেকেও তারা মুক্তি পাবে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ করযে হাসানা চালু করার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে ঋণ খেলাপী সংস্কৃতির অভিশাপ থেকে ও নিস্কৃতি দিতে পারে। খেলাপী বিনিয়োগের কারণে ব্যাংক তহবিলের একটি বিশাল অংশ অনুৎপাদনশীল সম্পদ খাতে পড়ে থাকে। এই অনুৎপাদনশীল সম্পদের কারণে ব্যাংকগুলো বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দেশের অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

খেলাপী সংস্কৃতি দুই প্রকারের হয়ে থাকে। এক. ইচ্ছাকৃত খেলাপী, দুই. অনিচ্ছাকৃত। গ্রাহকদের মধ্যে যারা প্রকৃতপক্ষে কোন কারণে ব্যবসায়িক লোকসানে নিপতিত হয়েছে, তাদেরকে সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ ও করযে হাসানা ফান্ড থেকে কর্য দিয়ে সাময়িক লোকসান থেকে উঠে আসার জন্য সহযোগিতা করা যায়। এর মাধ্যমে ব্যাংক ও দেশের অর্থনীতি সর্বোপরি সমাজ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। বিনিয়োগ বা ঋণের বিপরীতে তার যে সিকিউরিটি আছে তা কর্যের টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত আপাতত ব্যাংকের কাছেই থাকবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্য পরিশোধ করতে না পারলে তাকে লোকসান কাটিয়ে উঠার জন্য আরো সময় বাড়ানো যেতে পারে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ মানবতার কল্যাণের জন্য ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি বিশেষভাবে চিন্তা করতে পারে।

---

[২৫]. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ, রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, ২০০০, পৃ. ৬৯

আইন ও বিচার
বর্ষ-৮, সংখ্যা-২৯
জানুয়ারী-মার্চ : ২০১২

গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : প্রেক্ষিত ইসলাম

ড. মোঃ শামছুল আলম*
রাফিয়া সুলতানা**

[সারসংক্ষেপ: মুসলিম উম্মাহ সাম্প্রতিককালে যে সংকট অতিক্রম করছে সম্ভবত ইতঃপূর্বে কখনো তা মোকাবেলা করেনি। এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে মুসলিম উম্মাহ পশ্চাৎপদ নয়। আর এই পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ হলো জ্ঞান-গবেষণায় তাদের পিছিয়ে পড়া। এক সময় সারা পৃথিবী থেকে মানুষ জ্ঞান অর্জনের জন্য মুসলিম দেশে সমবেত হতো। এখন চিত্র উল্টো। মুসলিমগণ অমুসলিমদের সান্নিধ্যে নিজেদের এখন ধন্য মনে করছে। অথচ ইসলাম এমন একটি জীবন দর্শন যে, এখানে জ্ঞান-গবেষণাকে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহতে সামান্য বিরতিতে বার বার গবেষণার কথা বলা হয়েছে। ইসলামের গবেষণায় প্রমাণিত হবে যে, গবেষণা ছাড়া ইসলামের অনুসরণ অসম্ভব। এক একজন মুসলিম একার্থে এক একজন গবেষক। চিন্তাশীল মানুষ ছাড়া অনেক কিছু হওয়া সম্ভব কিন্তু প্রকৃত মুসলিম হওয়া সম্ভব নয়। আসলে একটি জাতির সংকট মুহূর্তে সব কিছুতেই তার ছাপ পড়ে। তারা পিছিয়ে পড়েছে নেতৃত্বে, অর্থে, মানবতায়, কৌশলে, পরিশ্রমে, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে। সারা দুনিয়ায় তারা এখন লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত ও উপেক্ষিত। এমনি দুরবস্থা হতে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করতে পারে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে ব্যাপক গবেষণা।]

গবেষণার সংজ্ঞা

'গবেষণা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর পরিচয় সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। গবেষণা শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুসন্ধান করা, চেষ্টা চালানো, শক্তি ব্যয় করা। বাংলা অভিধানে এর অর্থ অনুসন্ধান করা।[১] এর ইংরেজী প্রতিশব্দ Research এটি ল্যাটিন শব্দ 'জব (কোন কিছু পুনঃ পুনঃ করা) এবং ইংরেজী শব্দ

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. *সংসদ বাঙলা অভিধান*, ঢাকা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৮, পৃ. ১৯১

'Search' (খোঁজ করা, পরিদর্শন করা, অনুসন্ধান করা) যোগে গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ গবেষণার অর্থ হল কোন কিছুকে বিস্তারিতভাবে দেখা বা ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করা, ঝালাই দেয়া, নবায়ন করা, নতুন করে শক্তি দেয়া, উজ্জীবিত করা ইত্যাদি।[২]

এর আরবী প্রতিশব্দ হল تفقه ، تدبر، اعتبار، تفكر، اجتهاد ، بحوث ও جهاد পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে গবেষণা বা অনুসন্ধান অর্থে উপরোক্ত শব্দগুলোর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন-

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যে কেউ সাধনা করে, সে তো নিজের জন্যই সাধনা করে।"[৩]

"যারা আমার উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব।"[৪]

"তবে কি তারা কখনো এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেনি? অথবা তাদের নিকট কি এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি?"[৫]

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না?"[৬]

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "অতএব চিন্তা গবেষণা কর হে দৃষ্টিমান ব্যক্তিরা।"[৭]

"তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করতে পারে।"[৮]

"তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না? আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্ট কালের জন্য।"[৯]

চিন্তা, ভাবনা, গবেষণা অর্থে উপরোক্ত শব্দসমূহ হতে اجتهاد শব্দটি ইসলামী আইন শাস্ত্রে একটি বিশেষ পরিভাষা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 'ইজতিহাদ' শব্দটি আরবী جهد শব্দমূল হতে উৎপন্ন। এর অর্থ, কোন কাজে নিজেকে একান্তরূপে নিবিষ্ট

---

২. আহমাদ, *ইসলামী গবেষণার নীতি ও পদ্ধতি*, গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১, পৃ. ৯৮

৩. আল-কুরআন, ২৯:৬ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

৪. আল-কুরআন, ২৯:৬৯ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

৫. আল-কুরআন, ২৩:৬৮ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ

৬. আল-কুরআন, ৪:৮২ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ

৭. আল-কুরআন, ৫৯:২ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

৮. আল-কুরআন, ৯:১২২ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

৯. আল-কুরআন, ৩০:৮

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى

করা।[১০] অভিধানে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে مشقة (to make violant efforts, strain)[১১] প্রবল প্রচেষ্টা করা। 'আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা' গ্রন্থে ইজতিহাদের আভিধানিক অর্থ বলা হয়েছে, "কোন ইপ্সিত বিষয়ে শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার জন্য শক্তি সামর্থ্য ব্যবহার করা"।[১২] এছাড়া ইজতিহাদের অর্থ হল بذل السعى বা শ্রম ব্যয় করা, صرف الطاقة বা শক্তি খরচ করা, التفكر فى الامر বা কোন বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করা ইত্যাদি। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ নূর মোহাম্মদ আজমী এ প্রসঙ্গে বলেন, "ইজতিহাদের আভিধানিক অর্থ কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা"।[১৩] বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আবুল হাশিমের মতে, বুদ্ধির ব্যবহার যেখানে সরাসরিভাবে কুরআন হতে পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে কুরআনের মূলনীতিকে অবলম্বন করে বুদ্ধির ব্যবহার করাকেই ইজতিহাদ বলে। জিহাদ ও ইজতিহাদ একই মূল শব্দ হতে উদ্ভূত। জিহাদের অর্থ ইজতিহাদ অপেক্ষা আরো ব্যাপক। জিহাদ বহু প্রকারের হতে পারে। জীবনের সর্বক্ষেত্রের বহুমুখী সংগ্রামকে সমষ্টিগতভাবে জিহাদ বলা হয়। আধিমানসিক জীবনক্ষেত্রে যে সংগ্রামের প্রয়োজন হয়, তারই নাম ইজতিহাদ। ইজতিহাদ জিহাদেরই একটি বিশেষ অংগ। এও এক বিশেষ ধরনের জিহাদ। বুদ্ধিজগতে স্থবিরতা ও গতিহীনতার দ্বারা সৃষ্ট রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আধিমানসিক সংগ্রামের নামই ইজতিহাদ।[১৪] জনৈক মুসলিম পণ্ডিত এর শাব্দিক অর্থ বর্ণনা করে লিখেছেন-

Literally the word 'Ijtihad' means to put in the maximum of effort to ascertain, in a given problem or issue, the injunction of Islam & its real intent.

ইজতিহাদ-এর পারিভাষিক অর্থ- কোন বিশেষ বিষয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন করা; যেমন কোন বিশেষ ঘটনা বা আইনের কোন সূত্র সম্পর্কে মতামত গড়ে তোলা।[১৫] অর্থাৎ কুরআন, হাদীস এবং ইজমায় যা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, সে

---

১০. এস শরাফুদ্দীন, *ইজতিহাদ ও আল-কুরআনের ভাষ্যরীতি*, ঢাকা: *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ১৯৬৩, ৩য় বর্ষ, সংখ্যা-৪, পৃ. ৫৯

১১. قاموس الياس العصرى Cairo: Elias Modern Publishing & Co. Zaher, 1986

১২. *আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা*, কুয়েত মন্ত্রণালয়, খ. ১, পৃ.৩১৬ بذل الوسع والطاقة فى طلب امر ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته

১৩. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, 'ইজতিহাদ', *গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১, পৃ. ১৪

১৪. আবুল হাশিম, 'ইজতিহাদ', *গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১, পৃ. ২৭

১৫. এস শরাফুদ্দীন, প্রাগুক্ত

বিষয়ে সঠিক আইন নির্ণয়ের জন্য আইনবিদ যখন তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেন তখন তার এ কাজকে 'ইজতিহাদ' বলা হয়। অন্য কথায় যে ক্ষেত্রে কোন স্পষ্ট আইন কুরআন, হাদীস বা ইজমার মধ্যে পাওয়া না যায়, তখন সে বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়াসকে ইজতিহাদ বলা হয়। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যা দ্বারা যুক্তির সাহায্যে পবিত্র কুরআনের আইনকে একইরূপে অবরোহনের মাধ্যমে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। যদি কোন বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন উপস্থিত সমস্যার সমাধান কল্পে কোন সঠিক নীতি নির্ধারণ কঠিন হয়, তখন মুজতাহিদগণ নিজেদের সব রকম জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা-বুদ্ধি এবং ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা দিয়ে উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে যে গবেষণা চালান, তাই হল 'ইজতিহাদ'। যারা 'ইজতিহাদ' করেন তারা হলেন মুজতাহিদ।[১৬]

গবেষণার সংজ্ঞায় গবেষকগণ যা বলেছেন প্রত্যেকটির সমর্থনে বক্তব্য রয়েছে। গবেষণা যেহেতু একটি মহৎ কাজ তা-ই প্রতিটি মহৎ কাজের সাথে ইসলামের সংশ্লিষ্টতা থাকা প্রত্যাশিত। সে হিসেবে ইসলামে গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। 'গবেষণা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর পরিচয় সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। 'গবেষণা' শব্দটি বাংলা। এর সন্ধি বিচ্ছেদ করলেই এর অর্থ পাওয়া যায়। গো + এষণা = গবেষণা। গো অর্থ গরু আর এষণা অর্থ খোঁজ করা বা অন্বেষণ করা। অতএব হারানো গরু খুঁজতে যেমনি প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হয় এবং অলি-গলিতে প্রবেশ করতে হয় তেমনি গবেষককে গবেষণার স্বার্থে সীমাহীন শ্রম দিতে হয় এবং ঘাম ঝরাতে হয়। মোটকথা গবেষণা একটি জটিলতর কাজ। গবেষণা শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুসন্ধান করা, খোঁজ করা, তালাশ করা, চেষ্টা চালানো, শক্তি ব্যয় করা ইত্যাদি।

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত অভিধানে বলা হয়েছে, a diligent investigation of new facts and additional information; research. গবেষণা করা research; investigate. অন্যদিকে গবেষক শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, one who is engaged in research work; a researcher; research scholar.[১৭]

অন্যদিকে DEV'S CONCISE DICTIONARY তে বলা হয়েছে- রিসার্চ] গবেষণা; careful search. গবেষণা করা; engage in researches.[১৮]

---

[১৬]. *মুসলিম আইনের বিভিন্ন উৎস, মুসলিম ও পারিবারিক আইন পরিচিতি,* তা. বি. পৃ. ২৭

[১৭]. *Bangla Academy Bengali-English Dictionary,* Dhaka: Bangla Academy, 1994, p.163

[১৮]. Ashu Tosh Dev, Dev's *Concise Dictionary*, Calcutta: Dev Sahitya Kutir (p) Limited, 1992, p.598

অর্থাৎ যত্ন সহকারে খোঁজ করা, পরিদর্শন করা, অন্বেষণ, খোঁজ, অনুসন্ধান ইত্যাদি। আর search শব্দের অন্য ইংরেজী প্রতিশব্দগুলো হলো-Re-seek, জব-inspect, জব-inquiry, জব-investigation.[১৯]

আল-কুরআনে 'গবেষণা' শব্দের আরবী প্রতিশব্দের ব্যবহার : ইসলাম গবেষণার প্রতি এত বেশি জোর প্রদান করেছে যে, تتفكروا শব্দটি নিম্নোক্ত স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে- ৬:৫০, يتفكروا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নোক্ত স্থানসমূহে- ৭:১৮৪, ৩০:৮ يتفكرون শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নোক্ত স্থানসমূহে- ৩:১৯১, ৭:১৭৬, ১০:২৪, ১৩:৩, ১৬:১১, ৩০:২১, ৩৯:৪২, ৪৪,৬৯, ৪৫:১৩, ৫৯:২১

অন্যত্র বলা হয়েছে- "এভাবে আল্লাহ্ তাঁর বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-গবেষণা কর।"[২০] আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন চিন্তাশীল লোকদেরকে ভেবে-চিন্তে সত্যে উপনীত হওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে।
আরো একস্থানে শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে- "বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা কি চিন্তা-গবেষণা কর না?"[২১]

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, পার্থিব শক্তি অর্জনের জন্য চিন্তা-গবেষণার কোন বিকল্প নেই। কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা, কোনটি ঠিক, কোনটি ঠিক নয় তা চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমেই উদঘাটিত হয়ে থাকে। মহানবী স. ও নবুওয়্যাত লাভের পূর্বে সত্যের সন্ধানে হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। পরিশেষে তিনি সত্যের সন্ধান লাভ করেছিলেন। বস্তুত সত্য আপনা-আপনি আসে না, তা চেষ্টা-তদবীরের মাধ্যমে উদঘাটন করতে হয়।

ইসলামে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করে তাদের জীবনের বিধি-বিধান জানানোর উদ্দেশ্যে যুগে যুগে প্রত্যেক জাতির জন্য পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন, ঐশী গ্রন্থ পাঠিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় সবশেষে মুহাম্মদ স. কে পাঠিয়েছেন কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল স্থানের সব মানুষের পথনির্দেশক হিসেবে। অতঃপর নবী করীম স. আল্লাহর ওহীর সাহায্যে মানুষের জন্য একটি আদর্শ জীবন ব্যবস্থা কায়েম করলেন। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের সাথে সাথে ওহীর পথও রুদ্ধ হয়ে গেল।

---

[১৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৪

[২০]. আল-কুরআন, ২:২১৯, ২৬৬ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

[২১]. আল-কুরআন, ৬:৫০ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ

জীবনের নতুন কোন দিক ও বিষয় সম্বন্ধে সরাসরি ইসলামের বিধান জানার ক্ষেত্রে শূণ্যতা দেখা দিলে ইজতিহাদ বা শরঈ বিধান সম্বন্ধে গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ নূর মোহাম্মদ আজমী বলেন, "কোন সমাজ ব্যবস্থাই স্থান বা কালের প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। তাহার যতখানি অংশ স্থান ও কালের প্রভাব হইতে মুক্ত ততখানি হয় চিরন্তন বা অপরিবর্তনীয়, আর যতখানি স্থান বা কাল-সংশ্লিষ্ট, ততখানিতে স্থান-কালের পরিবর্তনের দরুন শূন্যতা দেখা দিতে পারে বা দিয়া থাকে। এই শূন্যতা পূরণ করার জন্য ইসলামে ইজতিহাদের ব্যবস্থা রহিয়াছে। মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ করিয়া যুগে যুগে এই শূন্যতা পূরণ করিবেন, ইহাই হইল ইসলামের বিধান"।[২২]

এছাড়া তাঁর মতে, ইজতিহাদ হচ্ছে ইসলামের জীবনীশক্তি। পানির নির্গমণ বন্ধ হয়ে গেলে যেমন নদীর প্রবাহ থেমে যাবে, তেমনি ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে গেলে ইসলাম গতিহীন হয়ে যাবে। এজন্যে প্রত্যেক যুগেই ইজতিহাদ আবশ্যক। যেমন শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী র.-এর মন্তব্য: 'আমি যে বলেছি... প্রত্যেক যুগেই ইজতিহাদ ফরয তার কারণ হল, ঘটনাবলী অন্তহীন অথচ সে সকল ঘটনা সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ কি তা জানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণ কর্তৃক যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা সকল যুগের জন্য যথেষ্ট।'[২৩] শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ র. আরো ঘোষণা করেন, মুক্তবুদ্ধি বা ইজতিহাদের দ্বার বন্ধ করে রাখা জাতির চিন্তাধারার গতিশীলতা বিনষ্ট করে দেয়ারই নামান্তর। এতে যুগের চাহিদা অনুযায়ী মুসলিম সমাজের মধ্যে যে সব নতুন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হবে, সে সবের উত্তর দেয়া সম্ভব হবে না। ফলে জাতির মধ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে।'[২৪] আল্লামা ইকবালও একমাত্র ইজতিহাদ ও ইজমার ব্যবহারের দ্বারাই ইসলামী ভাবধারার গতি সঞ্চার সম্ভব বলে মনে করতেন। এজন্যই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে পবিত্র কুরআন থেকে আলোক গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা তিনি বিশেষভাবে অনুভব করেন।[২৫]

ইসলামে ইজতিহাদের মূল অবলম্বন হল আল্লাহ্ প্রদত্ত ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআন; তারপর তাঁর রসূল স.-এর সুন্নাহ। পবিত্র কুরআন মৌলিক জ্ঞানের আধার হিসেবে মানুষের দিশারী। আল্লাহর দান খনিজ পদার্থ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য এদের

---

[২২]. নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[২৩]. প্রাগুক্ত

[২৪]. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী র., ঢাকা: *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পত্রিকা*, ৪৩ বর্ষ, সংখ্যা-১, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৩, পৃ. ১৩

[২৫]. আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

স্বরূপে ছাড়াও আরো বিভিন্নভাবে এদেরকে কাজে লাগানোর জন্য যেমন বুদ্ধির দরকার, তেমনি আল-কুরআন হতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বকালে উপকৃত হওয়ার জন্য প্রয়োগবুদ্ধি বা ইজতিহাদের প্রয়োজন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আবুল হাশিম বলেন, "সরাসরি প্রকৃতির দানস্বরূপ প্রাপ্ত জ্ঞান সভ্যতা-সংস্কৃতির রূপান্তরের সাথে সাথে মানুষের নতুন নতুন আধিমানসিক প্রয়োজন ক্ষেত্রবিশেষে মিটাইতে না পারিলেও এ জ্ঞানগুলির সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা মিটান অসম্ভব। সভ্যতা-সংস্কৃতির সাবলীল গতি ও পরিবর্তন অব্যাহত রাখিতে হইলে প্রকৃতির দানস্বরূপ বোধিলব্ধ জ্ঞানের সহিত বুদ্ধির সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। বুদ্ধির সংযোগের দ্বারা মৌলিক জ্ঞানের রূপান্তরের ফলে মানুষের সমস্ত আধিমানসিক প্রয়োজন যুগে যুগে পরিতৃপ্ত হইতে পারে"।[২৬] অতএব বলা যায়, জীবনকে সমৃদ্ধ করতে হলে আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ ও বুদ্ধির পারস্পরিক সংযোগ ও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। আবুল হাশিম আরো বলেন, "মানুষের নিজের অস্তিত্বের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিতে হইলে বস্তু এবং মানসজগৎ এই ক্ষেত্রেই বুদ্ধি ব্যবহারের প্রয়োজন অপরিহার্য। বস্তুর উপর যেমন বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা মানুষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তেমনি জ্ঞানের ক্ষেত্রেও আল-কুরআন এবং পূর্ববর্তী সমস্ত প্রত্যাদেশলব্ধ জ্ঞানকেও ইজতিহাদের সাহায্যে বাস্তব কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার করার প্রয়োজন আছে।[২৭]

নিত্য নতুন সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে ইমাম নাসায়ীর সুনান গ্রন্থে باب الحكم باتفاق اهل العلم নামক অনুচ্ছেদে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ বর্ণিত হাদীস, যাতে বলা হয়েছে-

"যদি তোমার সামনে এমন কোন বিষয় আসে, যার সুস্পষ্ট নির্দেশ কুরআনে নেই আর মহানবী স. ও এর কোন সমাধান দিয়ে যাননি, তবে সালফে সালেহীন (سلف صالحين) যেভাবে এর সমাধান দিয়েছেন, সেভাবেই তার সমাধান দিতে হবে। যদি এমন কোন ব্যাপার এসে উপস্থিত হয় যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ নেই, মহানবী স. ও তার কোন সমাধান দেননি তবে নিজের বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী ইজতিহাদ করবে এবং এ কথা বলবে না যে, আমি ভয় করছি।'[২৮] ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইমাম সারাখসী র. বলেন, "এমন কোন ব্যাপার নেই যা সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ হতে বৈধ বা অবৈধ, প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয়তার নির্দেশ দেয়া হয়নি। এটা স্বত:সিদ্ধ যে, প্রত্যেক ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। কেননা, কুরআন

---

[২৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

[২৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

[২৮]. ইমাম আবু আব্দির রহমান আহমদ ইবন শুআয়ব *আন-নাসায়ী, সুনানু মুজতাবা*, করাচীঃ নূর মোহাম্মদ প্রকাশনী, খ. ২, পৃ. ২৬৪

হাদীসের মূলপাঠ সীমিত। আর চলমান ঘটনাপঞ্জি কিয়ামত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত হতেই থাকবে। আর চলমান ঘটনাপঞ্জিকে حادثة বলার মাধ্যমে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকবে না।[২৯]

সত্য প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার জন্য : ইসলাম এসেছে সত্য প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার জন্য। গবেষণার সংজ্ঞা এবং উদ্দেশ্যের একটি পর্যায় হলো সত্য প্রতিষ্ঠা করা। এর সমর্থনে আল-কুরআন ও হাদীসে প্রচুর বক্তব্য রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ চান, তিনি তাঁর বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন।"[৩০] অন্যত্র বলা হয়েছে, "তিনি সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চান।"[৩১] সঠিকভাবের গবেষণা হলে সর্বদা সত্য প্রকাশিত হবে আর মিথ্যা চাপা পড়ে যাবে। ইসলাম এই মূলনীতি নিয়েই এসেছে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "বল, সত্য সমাগত এবং মিথ্যা অপসৃত। মিথ্যা অপসৃত হবারই।"[৩২]

বিশ্ব নেতৃত্বের জন্য : বিশ্ব নেতৃত্ব লাভের জন্য গবেষণার কোন বিকল্প নেই। এ প্রসঙ্গে আবুল আলা র. বলেন, "যে গোষ্ঠী বা দল চিন্তার রাজ্যে নেতা হয় এবং প্রাকৃতিক জগতের শক্তিসমূহে নিজের ইলম দিয়ে অধীন বানিয়ে নেয় তাদের নেতৃত্ব কেবল চিন্তার জগত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে তা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। পৃথিবীতে তাদের বিজয় সূচিত হয়। সম্পদের চাবিকাঠি তাদের হাতে চলে আসে, সে বৈজ্ঞানিক অভিলাষী হতে পারে। এ জন্য গোটা মানব জীবনের যাবতীয় কাজ কারবার একমাত্র সেই লোকদের চিন্তাধারা ও মননশীলতা অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, এ ক্ষমতা যাদের হাতে থাকবে তারা যদি খোদা বিমুখ হয়, তবে তাদের অধীনে কখনো এমন দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে সক্ষম হবে না যারা খোদামুখী হতে চায়।"[৩৩]

---

২৯. সারাখসী, উসূল, খ. ২, পৃ. ১৩৯ فان جاءه ليس في كتاب ولاقضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون فان جاءه امر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فيجتهد رأيه ولا يقول انى اخاف انى اخاف-

৩০. আল-কুরআন, ৮:৭ و يُرِيدُ اللّٰهُ أن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ

৩১. আল-কুরআন, ৮:৮ لِيُحِقَّ الحَقَّ وَيُبْطِلَ البَاطِلَ

৩২. আল-কুরআন, ১৭:৮১ وَقُلْ جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

৩৩. আফজাল হোসাইন, *শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (তালীম ওয়া তারবিয়াত)* ঢাকা: ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৩, পৃ. ৪৪০

গতিশীলতার জন্য : একজন মুসলিম বাস্তবে একজন গতিশীল মানুষ। সে সর্বদা নতুন নতুন চিন্তা করবে। মুসলিম সমাজকে গতিশীল রাখার স্বার্থে গবেষণা করা অপরিহার্য। গবেষণা ছাড়া জীবনযাত্রা থমকে দাঁড়ায়। গবেষণা এমন একটি ব্যাপার যা কোন একটি জায়গায় গিয়ে থেমে যায় না। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী র. বলেন, "মুক্তবুদ্ধি বা ইজতিহাদের দ্বার বন্ধ করে রাখা জাতির চিন্তাধারায় গতিশীলতা বিনষ্ট করে দেয়ার নামান্তর। এতে যুগের চাহিদা অনুযায়ী মুসলিম সমাজের মধ্যে যে সব নতুন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হবে, সে সবের উত্তর দেয়া সম্ভব হবে না। ফলে জাতির মধ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে।"[৩৪] 'ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ' নামক গ্রন্থ রচনা করে তিনি মুসলিম সমাজকে কুরআন হাদীসের আলোকে যে কোন সমস্যার মোকাবেলায় স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি প্রয়োগের আহবান জানান।[৩৫] শাহ সাহেবের এ প্রচেষ্টার ফলেই পরবর্তী যুগে গোটা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী চিন্তাধারায় এক ব্যাপক গতিশীলতার সৃষ্টি হয়। আল্লামা হামিদুদ্দীন ফারাহী, মুফতী আবদুহু, আমীর শাকীব আরসালান, জামালুদ্দীন আফগানী প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় চিন্তাবিদ, চিন্তায় গতিশীলতা ও মুক্তবুদ্ধি প্রয়োগের ব্যাপারে শাহ সাহেবের অনুসারী বলে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন।[৩৬]

অতএব বলা যায়, কিয়ামত পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ের অবস্থা ও সমস্যাসমূহের সমাধান, মানুষের নৈতিক ক্রমোন্নতির জন্য কুরআন ও হাদীসের মৌলিক জ্ঞানকে ভিত্তি করে গবেষণা করা আজ সময়ের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গবেষণার উপকারিতা

গবেষণার বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনেও অনেকগুলো উপকারের কথা উল্লেখিত আছে। যেমন-

নবীগণের মর্যাদার সাথে সংযুক্ত : আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যদি তারা তা রাসূল কিংবা তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা এর যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত।"[৩৭] আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম গাযালী র. বলেন, "এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়,

---

৩৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী র., ঢাকা: *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৩ বর্ষ, সংখ্যা-১, জুলাই-সেপ্টেম্বর' ২০০৩, পৃ. ১৩

৩৫. প্রাগুক্ত

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৩৭. আল-কুরআন, ৪:৮৩ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

গবেষকগণ অন্তর্নিহিত ব্যাপার বুঝতে সক্ষম হয়। আর আল্লাহর বিধান জানার ব্যাপারে তাদের মর্যাদাকে নবীদের মর্যাদার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।"[৩৮]

নিজের উপকার সাধিত হয় : গবেষণা এমন একটি বিষয় যে, এর দ্বারা মানবতা, বিশ্বসহ অন্যান্যদের সাথে আসল সফলতাটুকু গবেষক নিজেই পেয়ে থাকে। যারা গবেষণা কর্মে লিপ্ত তারা নিজেরাই তা উপলব্ধি করতে পারেন। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "যে কেউ চেষ্টা-সংগ্রাম করে, সে তো নিজের জন্যই চেষ্টা-সংগ্রাম করে।"[৩৯] অতএব নিজের অস্তিত্বের জন্যই প্রত্যেককে গবেষক ও চিন্তাশীল হওয়া উচিৎ।

সঠিক পথের দিশা পাওয়া যায় : চিন্তা-গবেষণা ব্যতীত হিদায়াত তথা সঠিক পথ পাওয়া যায় না। যারা ভেবে-চিন্তে কাজ করে না; তারা সর্বদা বিভ্রান্তিতে ডুবে থাকে। কোন অসচেতন ও গাফিল লোককে মহান আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সঠিক পন্থা উদ্ভাবনের জন্য মহান আল্লাহ্ সহায়তা করে থাকেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব।"[৪০]

সত্য উদঘাটিত হয় : গবেষণা করলে কোনটি সঠিক কোনটি সঠিক নয় তা জানা যায়। মিথ্যা হলে তাতে অনেক অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলা হয়েছে- "তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করে না? এটি যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসত তবে তারা তাতে অনেক অসংগতি পেত।"[৪১] মহানবী স. সম্পর্কে অবিশ্বাসীরা অনেক অমূলক ধারণা পোষণ করত। পরিশেষে তারা চিন্তা-গবেষণার পর সত্য বুঝতে পেরেছিল। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তারা কি চিন্তা করে না, তাদের সহচর উন্মাদ নয়; সে তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী।"[৪২]

দেশ ও জাতিকে চিন্তাশীল ও গবেষকরাই সতর্ক করতে পারে : মহান আল্লাহ্, "মুমিনদের সকলের এক সংগে অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে যাতে তারা সতর্ক হয়।"[৪৩]

---

[৩৮]. ইমাম গাযালী, *ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন,* ঢাকা: বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী, ১৯৮৬, খ. ১, পৃ. ১৮

[৩৯]. আল-কুরআন, ২৯:৬ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

[৪০]. আল-কুরআন, ২৯:৬৯ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

[৪১]. আল-কুরআন, ৪:৮২ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

[৪২]. আল-কুরআন, ৭:১৮৪ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

[৪৩]. আল-কুরআন, ৯:১২২ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

পথিকৃতের মর্যাদা পাবে : যে ব্যক্তি কোন একটি বিষয়ে সর্বপ্রথম গবেষণায় এগিয়ে আসবে তার মর্যাদা অনেক। তার দেখাদেখি যারা এগিয়ে আসবে তাদের সমপরিমাণ প্রতিদান সেও পাবে। মহানবী স. সে দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন কল্যাণের পথ দেখায়, তদনুযায়ী যে কাজ করবে তার সমপরিমাণ প্রতিদান সেও পাবে।"[৪৪] মহানবী স. আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি সৎ পথের আহবান জানাবে, সে সৎ পথের অনুসরণকারীর সমান প্রতিদান পাবে। এ দু'জনের কারও প্রতিদানে কম হবে না।"[৪৫] রসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেছেন, "আল্লাহর শপথ! যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ্ এক ব্যক্তিকেও পথ দেখান, তবে এটা তোমার জন্য লাল উট (সবচেয়ে মূল্যবান) অপেক্ষা উত্তম।"[৪৬]

সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যম : গবেষণা মানবতা ও মনুষ্যত্বের জন্য এক ধরনের সহায়তা। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "যতক্ষণ একজন বান্দা তার অপর ভাইকে সাহায্য করতে থাকে, ততক্ষণ আল্লাহও তাকে সাহায্য করতে থাকেন।"[৪৭]

বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক : মানুষের বুদ্ধিমত্তা বুঝার কিছু বিষয় থাকে। কোন ব্যক্তির কর্মতৎপরতাই প্রমাণ করে তার বুদ্ধির গণ্ডি কতটুকু। গবেষণা এমনি একটি বিষয়। এর দ্বারা মানুষের জ্ঞানের মাত্রা অনুধাবন করা যায়। আবূ যার রা. থেকে বর্ণিত। মহানবী স. বলেছেন, "চিন্তা করে কাজ করার মতো বুদ্ধিমত্তা আর নেই, আত্মসংযমের মতো পরহেযগারী আর নেই এবং চারিত্রিক সৌন্দর্যের মতো আভিজাত্য আর নেই।"[৪৮] আর যারা চিন্তা-গবেষণা না করে কথা বলে বা কাজ করে; তারা যে বোকা তাও জনসমক্ষে প্রতিভাত হয়ে যায়।

সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় : মহানবী স. জীবনে কখনো কোন কথা বলে বলেননি যে, 'আমি দুঃখিত।' কারণ তিনি ভেবে-চিন্তে কথা বলতেন বলে তাঁর সিদ্ধান্তে কোন ভুল ছিল না। এ জন্যই বাংলা ভাষায় বলা হয়, "ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না"।

আল্লাহর বিধানের যৌক্তিকতা বুঝা যায় : গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানাবলীর বৈজ্ঞানিক যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। কোন খাদ্য বা কর্মকে কেন বৈধ বা

---

৪৪. ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী র., *রিয়াদুস সালেহীন*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৬, খ. ১, পৃ. ১২৪ من دلّ على خير فله مثل اجر فاعله

৪৫. *রিয়াদুস সালেহীন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩ من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذالك من اجورهم شيئا

৪৬. প্রাগুক্ত, والله لان يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم

৪৭. *রিয়াদুস সালেহীন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২ والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون اخيه

৪৮. *মাসিক পৃথিবী* (ইসলামী গবেষণা পত্রিকা), ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯, পৃ. ৫

অবৈধ করা হল তার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। এতে ইসলামের প্রতি মানুষের অনুরাগ আরো বৃদ্ধি পায়। যেমন ইসলামে মাদকদ্রব্য অবৈধ। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে, সাময়িক কিছু উপকার এতে নিহিত আছে মনে করা হলেও এর অপকারিতার মাত্রা সীমাহীন। অতএব এর অবৈধতা যুক্তিযুক্ত। ইসলাম অশ্লীলতাকে হারাম করেছে। গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, অশ্লীলতা ভোগান্তি বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে ইসলাম যে সব বস্তু বৈধ ঘোষণা করেছে, সেগুলো নিয়ে গবেষণা করলে দেখা যাবে, সেগুলো কল্যাণকর। যেমন বৃক্ষরোপণ ও শিশুর মাতৃদুগ্ধ পান। এমন কোন গবেষক খুঁজে পাওয়া যাবে না যে বলবে যে, এগুলো যুক্তিযুক্ত নয়। বরং যত সময় গড়াবে ততই ইসলামী বিধানাবলীর যৌক্তিকতা বেশি প্রমাণিত হবে। এমনিভাবে যে কোন গবেষণার দ্বারা এ সত্য আরো বেশি প্রমাণিত হবে।

জীবনে প্রাচুর্য আসে : গবেষণার মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রাচুর্য আসে। জীবন যাত্রা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। সংকীর্ণতা ও দারিদ্র্য দূরীভূত হয়। আল-কুরআনের ছোট একটি সূরা আল-আসরের ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ বলতেন, "যদি মানুষ এ সূরা (সূরা আল-আসর) নিয়ে গবেষণা করত তাহলে তাদের জন্য নিশ্চিত সমৃদ্ধি আসত।"[৪৯] এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট জগতে যে জাতি যত উন্নত ও সমৃদ্ধ দেখা যাবে তারা গবেষণায় অনেক এগিয়ে গেছে। ইমাম শাফিঈ র. উদাহরণ স্বরূপ সূরা আল-আসরের কথা বলেছেন। এমনিভাবে অন্যান্য সূরা নিয়ে গবেষণা করলে মানুষ আরো বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

পরিত্রাণের উপায় : যারা গবেষণায় ব্যস্ত থাকে তাদের জন্য পরকালিন জীবনও সুখকর হবে। জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে তারা পরিত্রাণ পাবে। এমন ব্যক্তিদের মহান আল্লাহ্ পরকালে শাস্তি না দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "অশ্রু বিসর্জনকারী চোখ এবং চিন্তা-গবেষণায় ব্যস্ত হৃদয়ের অধিকারীর কোন শাস্তি হবে না।"[৫০]

গবেষণাবিমুখতার পরিণতি

যারা গবেষণা ছেড়ে দেয় তারা বহু সমস্যার মুখোমুখি হয়। যেমন-

তালাবদ্ধ হৃদয় : গবেষণাবিমুখ মস্তককে আল-কুরআন তালাবদ্ধ তথা হৃদয় বলে আখ্যায়িত করেছে। তাদের সাধারণ ধারণক্ষমতা আর থাকে না। মহান আল্লাহ্

---

[৪৯]. অধ্যাপক আহমদ আল-কুরদী, *তাফসীরুল কুরআনিল কারীম*, আরবী ভাষা বিভাগ, মদীনাঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০৯ পৃ. ৩০

كان الشافعي رحمه الله يقول: لو تدبّر الناس هذه السورة لوسعتهم

[৫০]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ্ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-জানায়িয, দিল্লীঃ আল-মাকতাবাহ রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب

বলেন, "তবে কি ওরা কুরআন নিয়ে গভীর মনোযোগসহ চিন্তা-গবেষণা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?"[৫১]

নিকৃষ্টতম জীব : আল্লাহ্ তাআলা গবেষণায় পিছিয়ে পড়া লোকদের ব্যাপারে বলেন, "আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মূক যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।"[৫২]

দুআ গৃহিত হয় না : গবেষণাবিমুখ মন হলো অমনোযোগী। ইসলামে বেকারত্বের কোন স্থান নেই। এ ধরনের লোকের আহাজারিতেও মহান আল্লাহ্ গুরুত্ব দেন না। মহানবী স. বলেছেন, "আল্লাহ্ অমনোযোগী হৃদয়ের দুআ কবুল করেন না।"[৫৩]

অনিবার্য ধ্বংস : গবেষণাবিমুখ মানুষের জন্য ধ্বংস রয়েছে। ইবনু মারদুবিয়াহ বলেন, সূরা আলে-ইমরানের ১৯১ নং আয়াতের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "ধ্বংস সে ব্যক্তির জন্য যে তা পাঠ করল অথচ তা নিয়ে গবেষণা করল না।"[৫৪] একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, মহানবী স. সাধারণত মানুষের জন্য ধ্বংসের কথা বলতেন না। কিন্তু গবেষণাবিমুখ মানুষের জন্য অত্যধিক গুরুত্বের কারণেই তিনি ধ্বংসের কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। উপরোক্ত গবেষণাধর্মী আয়াত সম্পর্কে আরো একটি দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। তাহলো-

> আতা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও উবাইদ ইবনে উমাইর আয়েশা রা.-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। উবাইদ ইবনে উমাইর রা. বললেন, আপনি আমাদের নিকট আপনার দেখা রসূলুল্লাহ্ স.-এর সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করুন। এ কথায় তিনি কেঁদে ফেললেন। অতঃপর বললেন, কোন এক রাতে নবী স.ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বললেন : হে আয়েশা! আমাকে কিছুক্ষণ আমার প্রতিপালকের ইবাদত করতে দাও। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আপনার নৈকট্য পছন্দ করি এবং যে বিষয় আপনাকে আনন্দিত করবে তা পছন্দ করি। অতএব তিনি স. উঠে গিয়ে অযূ করলেন। অতঃপর সালাতে রত হলেন। তিনি অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকলেন, এমনকি অশ্রুতে তাঁর বুক ভিজে গেলো। অতঃপর বিলাল রা. তাঁকে (ফজরের) সালাত সম্পর্কে অবহিত করতে এলেন। বিলাল রা. তাঁকে কাঁদতে দেখে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি কাঁদছেন,

---

[৫১]. আল-কুরআন, ৪৭:২৪ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

[৫২]. আল-কুরআন, ৮ : ২২ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

[৫৩]. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আদ-দাওআত, অনুচ্ছেদ : ৬৫, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০ ان الله لايستجيب دعاء من قلب غافل

[৫৪]. ইবনে কাসীর, তাফসীরু ইবনে কাসির, খ.১, পৃ. ৩৪৮, ইহসান কী তাকরীরে সহীহ ইবন হিব্বান, পৃ. ৩৮৭

> অথচ আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর সমস্ত ভুলত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দাহ্ হবো না? আজ রাতে আমার উপর কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে। যে ব্যক্তি সেই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে চিন্তাভাবনা করলো না তার জন্য দুঃখ হয়। তা (হলো)ঃ[৫৫] "আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে... নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।"[৫৬]

তাছাড়া জ্ঞান-গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত না থাকলে সেখানে এসে ভর করে অলসতা, পরচর্চা, পরনিন্দা, অযথা কথা ও কাজ, ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, ঘৃণা, সন্ত্রাস, এমনি ধরনের অনর্থক কাজ ও চিন্তা। কারণ কোন কিছুকে ভাল কিছু দিয়ে ব্যস্ত না রাখলে সেখানে মন্দ জিনিস এসে জায়গা করে নেয়। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের দুরবস্থার জন্য মুসলিম জাতির গবেষণাবিমুখতাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করলে অত্যুক্তি হবে না।

ইসলামে গবেষণার গুরুত্ব

আবশ্যিক : ইসলামে গবেষণা কোন ঐচ্ছিক বিষয় নয়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "অতএব হে চক্ষুষমান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।"[৫৭] অতএব গবেষণাকে ইসলামের আবশ্যিক একটি বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে গবেষণায় লিপ্ত হতে হবে। ইসলামের অন্যান্য আবশ্যিক কাজের ন্যায় গবেষণাকেও আবশ্যিক মনে করতে হবে।

আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া : মহান আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর গুণে গুণান্বিত হতে বলেছেন। মহান আল্লাহর নিরানব্বইটি গুণবাচক নাম রয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলো নাম গবেষণাকে উৎসাহিত করে। যেমন-

'আল-খালিক' (الخالق) অর্থাৎ সৃষ্টিকারী, সৃজনকর্তা, সৃষ্টিশীল-এ নামের দ্বারা বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহর এ গুণ ধারণ করে গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন বিষয় সৃষ্টি করতে হবে। আল-কুরআনের আট স্থানে الخالق শব্দটি এসেছে। যথা- ৬:১০২, ১৩:১৬, ১৫:২৮, ৩৫:৩, ৩৮:৭১, ৩৯:৬২, ৪০:৬২, ৫৯:২৪ এক স্থানে বলা হয়েছে, "তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সকল উত্তম নাম।"[৫৮]

---

[৫৫]. হাফিজ আবু শায়খ আল-ইসফাহানী র., *আখলাকুন্নবী স.* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪, হাদীস নং- ৫৪৬, পৃ. ২৬৭

[৫৬]. আল-কুরআন, ৩:১৯০-১৯৪ إن في خلق السماوات والأرض ...... إنك لا تخلف الميعاد

[৫৭]. আল-কুরআন, ৫৯:২ فاعتبروا يا أولي الأبصار

[৫৮]. আল-কুরআন, ৫৯:২৪ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى

তাঁর আরেকটি নাম হলো 'আল-বারি' (البارئ) উদ্ভাবনকর্তা, আবিষ্কারক। আল-কুরআনের তিন স্থানে শব্দটি এসেছে ৫৯:২৪, ২:৫৪, ২:৫৪ । উপরোক্ত আয়াতে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়।

'আল-মুসাব্বির' (المصور) অর্থাৎ রূপদাতা। উপরের একই আয়াতে (৫৯:২৪) শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। গবেষক তাদের গবেষণার মাধ্যমে নতুন একটি বিষয়ের রূপ দিয়ে থাকেন।

'আল-বাদি' (البديع) অর্থাৎ স্রষ্টা, উদ্ভাবক, অস্তিত্ব প্রদানকারী ইত্যাদি। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা।"[৫৯]

'আল-বাসির' (البصير) অর্থাৎ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, দ্রষ্টা ইত্যাদি। গবেষক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন না হলে সফল হতে পারে না।

'আল-লাতীফ' (اللطيف) অর্থাৎ সূক্ষ্মদর্শী, গভীর পর্যবেক্ষক। এ শব্দটি আল-কুরআনের সাত স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- ৬:১০৩, ১২:১০০, ২২:৬৩, ৩১:১৬, ৪২:১৯, ৬৭:১৪, ৩৩:৩৪ । গবেষককে সূক্ষ্মদর্শী হতে হয়।

'আল-খাবীর' (الخبير) অর্থাৎ অবহিত, যিনি অনেক জানেন। আল-কুরআনের ৪৫টি স্থানে শব্দটি এসেছে। যথা-২:২৩৪, ২৭১, ৩:১৫৩,১৮০, ৪:৩৫,৯৪,১২৮,১৩৫, ৫:৮,৬:১৮,৭৩১০৩, ৯:১৬, ১১:১,১১, ১৭:১৭,৩০,৯৬, ২২:৬৩, ২৪:৩০,৫৩, ২৫:৫৮,৫৯, ২৭:৮৮, ৩১:১৬,২৯,৩৪, ৩৩:২,৩৪, ৩৪:১, ৩৫:১৪,৩১, ৪২:২৭, ৪৮:১১, ৪৯:১৩, ৫৭:১০, ৫৮:৩,১১,১৩, ৫৯:১৮, ৬৩:১১, ৬৪:৮, ৬৬:৩, ৬৭:১৪, ১০০:১১, যেমন বলা হয়েছে, "তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।"[৬০] গবেষককে অনেক কিছু জেনে-বুঝে গবেষণা করতে হয়।

'আল-হাফিয' (الحفيظ) অর্থাৎ মহাসংরক্ষক, সুখস্থকারী ইত্যাদি। আল-কুরআনে আটবার শব্দটি এসেছে। যথা-৬:১০৪, ১১:৫৭,৮৬, ১২:৫৫, ৩৪:২১, ৪২:৬, ৫০:৪,৩২। এক স্থানে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।"[৬১] গবেষককে অনেক কিছু সংরক্ষণ করতে হয়।

'আর-রাকীব' (الرقيب) অর্থাৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপকারী। আল-কুরআনের পাঁচ স্থানে শব্দটি এসেছে। যথা- ৪:১, ৫:১১৭, ১১:৯৩, ৩৩:৫২, ৫০:১৮। এক স্থানে বলা

---

৫৯. আল-কুরআন, ২:১১৭ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

৬০. আল-কুরআন, ২:২৩৪ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

৬১. আল-কুরআন, ১১:৫৭ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ

হয়েছে, "আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"[৬২] গবেষককে তার গবেষণায় গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয়।

'আয-যাহির' (الظاهر) অর্থাৎ প্রকাশকারী, ব্যক্তকারী ইত্যাদি। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।"[৬৩]

'আল-জামি' (الجامع) অর্থাৎ জমাকারী। গবেষককে অনেক তথ্য, তত্ত্ব ও উপাত্ত সংগ্রহ করে গবেষণা করতে হয়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমাবেশ করবে এতে কোন সন্দেহ নেই।"[৬৪]

'আল-হাদি' (الهادى) অর্থাৎ পথপ্রদর্শক। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী রূপে যথেষ্ট।"[৬৫] গবেষককে গবেষণার মাধ্যমে মানুষকে পথপ্রদর্শনের ভূমিকা নিতে হয়। বিপদ-আপদ ও সংকটকালে জাতি গবেষকদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'আন-নাফি' (النافع) অর্থাৎ উপকারকারী। গবেষকগণ তাদের গবেষণা ও আবিষ্কার দ্বারা মানবতার উপকার করে থাকেন। কারণ তাদের গবেষণার ফসল বিদ্যুৎ, কম্পিউটার, প্লেন, রেলগাড়ি, ফটোকপি মেশিন, টেলিফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স ইত্যাদি। এগুলোর উপকারিতা বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই।

'আল-মুবদী' (المبدى) অর্থাৎ প্রকাশকারী। গবেষককে সত্য প্রকাশকারী হিসেবে আবির্ভূত হতে হয়।

'আল-মুহয়ী' (المحيى) অর্থাৎ পুনর্জীবনদানকারী, জীবিতকারী। গবেষক বিভিন্ন বিষয়কে মানুষের সামনে পুনর্জীবন দিয়ে থাকে।

'আল-ওয়াজিদ' (الواجد) অর্থাৎ অস্তিত্ব প্রদানকারী। গবেষকগণ তাদের গবেষণার মাধ্যমে অনেক কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

'আল-মুকাদ্দিমু' (المقدم) অর্থাৎ সামনে অবস্থানকারী। গবেষককে সামনে থেকে গবেষণা ও আবিষ্কারে নেতৃত্ব দিতে হয়।

'আল-মুবীন' (المبين) অর্থাৎ প্রকাশকারী, ব্যক্তকারী ইত্যাদি। আল-কুআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহই সত্য প্রকাশক।"[৬৬]

---

৬২. আল-কুরআন, ৩৩:৫২ وكان الله على كل شيء رقيبا

৬৩. আল-কুরআন, ৫৭:৩ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم

৬৪. আল-কুরআন, ৩:৯ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه

৬৫. আল-কুরআন, ২৫:৩১ وكفى بربك هاديا ونصيرا

৬৬. আল-কুরআন, ২৪:২৫ أن الله هو الحق المبين

সর্বোপরি মহান আল্লাহর নামসমূহও মানুষকে গবেষণার প্রতি আহবান জানায়।

বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য : মুমিনদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সে সব বৈশিষ্ট্য দেখে অন্যদের থেকে তাদেরকে আলাদা করা যায়। গবেষণা মুমিনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। এমনকি যে যত চিন্তাশীল ও গবেষক সে তত বড় মুমিন। মহানবী স. বলেছেন, "মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চিন্তাশীল হলো মু'মিন ব্যক্তি।"[৬৭]

কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে গবেষণার জন্য : মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অবতরণ মহান এক উদ্দেশ্যে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, মানুষ কুরআন নিয়ে গবেষণা করবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "এক কল্যাণময় কিতাব, এটি আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ-এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।"[৬৮]

একটি দল সর্বদা গবেষণা করবে : ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। এক একটি দল এক একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবে এবং কাজ করবে। তবে একটি দলকে অবশ্যই গবেষণায় মনোযোগী হতে হবে।[৬৯] "সূরা তওবায় যারা জিহাদ-বিমুখ হয় তাদেরকে ধিক্কার দিয়ে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এ সূরার ১২২নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, "ঈমানদারদের সকলকে একত্রে জিহাদে যাওয়া ঠিক নয়। সুতরাং তাদের প্রত্যেক দলের মধ্য হতে একটি অংশ জিহাদে যায় না কেন? যাতে তারা দীনি জ্ঞান-গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে পারে এবং নিজ কওমে ফিরে এসে যাতে তারা অসৎ কাজ সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে।"[৭০]

সত্য প্রকাশিত হয় : গবেষণা ও ইসলাম শব্দদ্বয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গবেষণার সংজ্ঞা এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি কথা হল, সত্য প্রকাশ করা। আর ইসলামের আগমন হয়েছে এ উদ্দেশ্যেই। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, "সত্য এসে গেছে এবং বাতিল বিলীন হয়ে গেছে। নিশ্চয় বাতিল বিলীন হওয়ারই কথা।"[৭১]

---

[৬৭]. ইমাম ইবনে মাজা, *আস-সুনান*, দেওবন্দ: আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি., অধ্যায় : আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদ : ২, أعظم الناس هما المؤمن

[৬৮]. আল-কুরআন, ৩৮:২৯ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

[৬৯]. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *আধুনিক যুগ ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচি*, অনুবাদঃ মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী, ঢাকাঃ নতুন সফর প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ২৭

[৭০]. আল-কুরআন, ৯:১২২ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

[৭১]. আল-কুরআন, ১৭:৮১ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

নিদর্শনাবলী চিন্তাশীল লোকের জন্যই : মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "এভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।"[৭২] মহান আল্লাহ্ আরো বলেছেন, "এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।"[৭৩] পৃথিবীতে অসংখ্য নিদর্শন ও ইঙ্গিত রয়েছে, তা থেকে উপকৃত হতে পারে গবেষক মনের ব্যক্তিরাই। অন্যরা অনেক কিছু দেখে কিন্তু অন্তর্নিহিত কিছু নিয়ে কখনো ভাবে না। এদের মধ্যে আর জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। এদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে তদ্দ্বারা দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে তদ্দ্বারা শ্রবণ করে না; তারা পশুর ন্যায়, বরং তারা অধিক বিভ্রান্ত। তারাই গাফিল।"[৭৪]

আসলে বুদ্ধিদীপ্ত লোকদের কাছে সত্য একদা প্রকাশিত হবেই। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আর জ্ঞানবান লোকদের সম্মুখে আমরা প্রকৃত সত্যকে উদ্ঘাটিত ও উদ্ভাসিত করে তুলবো।"[৭৫]

দৃষ্টান্তসমূহ চিন্তাশীল লোকের জন্যই : বিশ্ব জগতে কোটি কোটি উপমা রয়েছে। বিশেষত আল-কুরআনে অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ সব কিছু থেকে চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই উপকৃত হতে পারে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি এ সমস্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা করে।"[৭৬]

ইবাদত তুল্য : গবেষণাকে ইসলাম ইবাদত গণ্য করেছে। মুমিনের গবেষণাই ইবাদাত। বিশিষ্ট তাবিঈ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব র.-এর দাসি 'বারদ' একবার তাঁর মনিবের নিকট কিছু মানুষের 'ইবাদাত' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বললেন, মানুষ জুহর থেকে আসর পর্যন্ত একাধারে ইবাদাত করতে থাকে। সাঈদ র. বললেন, "আল্লাহর কসম! এটা ইবাদাত নয়। তুমি কি জান ইবাদাত কাকে বলে? ইবাদাত বলে, আল্লাহর আদেশসমূহের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা ও তাঁর নিষেধসমূহ থেকে দূরে থাকাকে।"[৭৭] ড. ইউসুফ আল-কারযাভী তাঁর التربية الإسلامية ومدرسة حسن

---

[৭২]. আল-কুরআন, ১০:২৪ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون

[৭৩]. আল-কুরআন, ১৩:৩, ১৬:১১, ৬৯, ৩০:২১, ৩৯:৪২, ৪৫:১৩ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

[৭৪]. আল-কুরআন, ৭:১৭৯ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون

[৭৫]. আল-কুরআন, ৬:১০৫ ولنبينه لقوم يعلمون

[৭৬]. আল-কুরআন, ৫৯:২১ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون

[৭৭]. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, সাঈদ ইবনে আল-মুসায়্যিব (রহঃ), *মাসিক পৃথিবী*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০২, পৃ. ১৪

البنا গ্রন্থে বলেন, "ইসলামের চিন্তা-গবেষণা হল ইবাদত দলীল-প্রমাণ অন্বেষণ করা ওয়াজিব এবং জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয। যেমনিভাবে অচলায়তন হলো নোংরা এবং অন্ধ অনুসরণ হলো অন্যায়।"[৭৮]

তাফসীরে মারেফুল কুরআনে সূরা আলে-ইমরানের ১৯০-১৯১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, فكر ও تفكر এর শাব্দিক অর্থ হল- বিবেচনা করা, কোন বিষয়ের তাৎপর্য ও বাস্তবতা পর্যন্ত পৌছতে চেষ্টা করা। এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ তাআলার 'যিকর' যেমন 'ইবাদত' তেমনি 'ফিকর' বা গবেষণা করাও ইবাদত।[৭৯]

ইসলাম গবেষণাকে শুধু একটি ইবাদত হিসেবে গণ্য করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং একে সর্বোত্তম ইবাদত হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের সমতুল্যও ঘোষণা করেছে। এছাড়া হাদীসে এসেছে- মহানবী স. বলেছেন, "স্বীয় বিছানায় হেলান দিয়ে জ্ঞান গবেষণাকারীর একঘণ্টা অবস্থান সাধারণ ইবাদতকারীর ষাট দিনের ইবাদতের চেয়ে উত্তম"।[৮০]

জিহাদের সমতুল্য : জিহাদ করা কখনো কখনো সাধ্য-সীমার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। কারণ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে কেউ অল্প সময়ে হতে জিহাদে শহীদ পারে। কিন্তু গবেষণার জন্য তাকে অনেক সময় ও শ্রম দিতে হয়। আবেগ দিয়ে জিহাদ হয় কিন্তু গবেষণা হয় না। গবেষণার জন্য প্রচুর ধৈর্য ও ত্যাগ প্রয়োজন। মুসনাদে ইবনে আবদুল বার এর একটি দীর্ঘ হাদীসে এসেছে, মুআয ইবন জাবাল রা. বলেন, মহানবী স. বলেছেন, "শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করা জিহাদ তুল্য।"[৮১]

---

[৭৮]. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *আত-তারবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ওয়া মাদরাসাতু হাসান আল-বান্না,* আল-ইত্তিহাদুল ইসলামী আল-আলামী লিল মুনাযযামাতিত তুল্লাবাত, ১৪০৩-১৯৮৩ পৃ. ৭১-৭২ فالتفكير فى الاسلام عبادة وطلب البرهان واجب وطلب العلم فريضة كما ان الجمود رذيلة ، والتقليد جريمة

[৭৯]. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খ. ২, পৃ. ২৯৬

[৮০]. ইমাম দারিমী, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-জিহাদ, বৈরূত: দারু ইহইয়াইস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ, ১২৯৩, تفكر ساعة خير من عبادة سنة

[৮১]. ইমাম আবদুল আযীম আল-মুনযেরী, অনুবাদ: হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক, *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব* (হাদীস সংকলন) খ. ১, ঢাকা: হাসনা প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ৬১-৬২ والبحث عنه(العلم) جهاد

সিয়ামের সমান : সিয়াম তথা রোযা ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের অন্যতম। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "সাওম আমার জন্য আর এর প্রতিদান আমি স্বয়ং দিব।"[৮২] রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "জ্ঞান-গবেষণা (মর্যাদায়) সিয়ামের সমান।"[৮৩]

বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ : গবেষণা কারো বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ বহন করে। যে যত বড় গবেষক সে তত বড় জ্ঞানী। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "আবিষ্কার (গবেষণা) ছাড়া কোন বুদ্ধিমত্তা/প্রজ্ঞা নেই।"[৮৪] ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী রা. এমন প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি বলেছেন, "বুদ্ধিমান কোন কিছু প্রথমে অন্তর দিয়ে অনুভব করে, তারপর সে সম্বন্ধে মন্তব্য করে। নির্বোধেরা প্রথমেই মন্তব্য করে বসে এবং পরে চিন্তা করে।"[৮৫]

গবেষণা ভুল হলেও প্রতিদান আছে : গবেষণা ইসলামের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যে, এতে সফল হলে স্বাভাবিক ভাবে যেমন এর প্রতিদান পাওয়া যাবে, তেমনিভাবে এতে সফল না হলেও শুধু চেষ্টা করার কারণে এর জন্য সওয়াব পাওয়া যাবে। যেমন, আমর ইবনুল আস রা. কে বিচারপতি নিয়োগকালে রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "তোমার রায় যদি সঠিক হয় তবে তুমি দশটি নেকী লাভ করবে আর রায়ের ক্ষেত্রে তোমার ইজতিহাদ ভুল হলেও একটি নেকী লাভ করবে"।[৮৬]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে- আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ্ স. কে বলতে শুনেছেন: "কোন বিচার-ফয়সালা দেয়ার ব্যাপারে ইজতিহাদ (চিন্তা-ভাবনা) করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তাকে দুটি সওয়াব দেয়া হয় এবং ইজতিহাদে ভুল করলে একটি সওয়াব দেয়া হয়"।[৮৭]

আর গবেষকগণের জন্য আশার কথা হল যে, তারা পার্থিব জীবনে যাই পান না কেন পরকালে আল্লাহ অবশ্যই উত্তম ও যথাযথ পুরস্কার দিবেন। তাদের এ কাজ সদকায়ে

---

৮২. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ. ৩০০ الصوم لي وانا اجزى به

৮৩. *আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, প্রাগুক্ত, التفكر فيه يعدل الصيام

৮৪. ইমাম ইবনে মাজা, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আয-যুহদ, অনুচ্ছেদ : ২৪, প্রাগুক্ত, لاعقل كالتدبير

৮৫. নজরুল ইসলাম, *মুসলিম মনীষী বাণী চিরন্তনী*, ঢাকা: প্রমিনেন্ট পাবলিকেশন্স, ২০০০, পৃ. ৪০

৮৬. মোহাম্মদ উদ্দীন বখতিয়ার, ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা, চট্টগ্রাম: *মাসিক তরজুমান*, ২০০১, পৃ. ২৫

৮৭. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আকযিয়া, عن عمرو بن العاص (رض) انه سمع رسول الله (ص) يقول: اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران ، وان حكم واجتهد فأخطأ فله اجر

জারিয়াহ হিসেবে বিবেচিত হবে। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন- "যখন কোন মানুষ মারা যায়, তখন তিনটি ব্যতীত তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায় ... একটি হল তার এমন জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।" এভাবে গবেষণা দ্বারা মানুষ উপকৃত হলে গবেষক আল্লাহর কাছে বিশাল মর্যাদার অধিকারী হয়। আর ইসলামকে উচ্চকিত ও সেরা প্রমাণের জন্য গবেষণা তো বিরাট ব্যাপার। সকল নবী এ গবেষণায় নিজকে ব্যাপৃত করেছিলেন। তাদের চিন্তা-গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল একটিই তা হলো ইসলাম প্রতিষ্ঠা। তাই এসব লোককে আল্লাহ বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে বেছে নেন।

গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া বিধানাবলীর বৈজ্ঞানিক যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। কোন খাদ্য বা কর্মকে কেন হারাম করা হল বা তার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষের আনুগত্য আরো বেড়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আল-কুরআন মাদক হারাম ঘোষণা করেছে। পরবর্তীতে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে যারা গবেষণা করেন তারা এটি হারাম হওয়ার কারণ খুঁজে বের করেছেন। তেমনিভাবে ইসলাম অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করেছে, যতই গবেষণা করা যায় এবং দিন চলে যায় ততই এর যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। ইসলামে বৃক্ষ রোপনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এমনিভাবে ইসলামে শিশুদেরকে মাতৃদুগ্ধ পান করানোর ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, ইসলামের এ বিষয়ের বক্তব্যটি যথার্থ। এ ব্যাপারগুলো প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে ইসলাম বলেছে। আর এখন বিজ্ঞানীরা ও গবেষকরা বলতে বাধ্য হচ্ছেন।

শ্রেষ্ঠত্বের কারণ : মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব তথা আশরাফুল মাখলুকাত। এ মর্যাদার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, মানুষের গবেষণা ও চিন্তা করার ক্ষমতা বা বিবেচনাবোধ, যা অন্যান্য প্রাণী হতে মানুষকে আলাদা করেছে। এমন বহু প্রাণী রয়েছে যাদের গতি, ক্ষিপ্রতা, আকার ও আয়তন মানুষের চেয়ে অনেক বেশী ও বড়। কিন্তু চিন্তা ও বিবেক খাটানোর যোগ্যতা থাকার কারণে মানুষ পৃথিবীর সকল জীবের উপর কর্তৃত্ব করছে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে।"[৮৮]

কৃতজ্ঞতার মাধ্যম : মহান আল্লাহ্ মানুষকে অনেক নিআমত দিয়েছেন। এ সবের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হবে। গবেষণা সে কৃতজ্ঞতার একটি পর্যায়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "তিনিই তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।"[৮৯] আর এ সব অঙ্গের দাবি পূরণই হলো এ গুলোর দ্বারা আল্লাহর শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

---

৮৮. আল-কুরআন, ৩:১১০ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

৮৯. আল-কুরআন, ২৩:৭৮ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

অনুমান হতে বাঁচার উপায় : অনুমান বা আন্দাজের বিপরীত ধারণা হলো গবেষণা। ইসলামে অনুমাননির্ভর কথা ও কাজ বড় ধরনের অপরাধ। কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে চিন্তা-গবেষণা করে। নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। অনুমান-নির্ভর কথার ব্যাপারে সাবধান করে মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা বেশি অনুমান করা থেকে দূরে থাক।"[৯০]

পরকালে প্রশ্ন করা হবে : প্রত্যেকটি মানুষকে পরকালে তার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে। বিশেষত গবেষণা সম্পাদিত হয় যে সব অঙ্গ দিয়ে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়- এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।"[৯১] অতএব এসব অঙ্গকে গবেষণার কাজে ব্যবহার না করলে পরকালে জবাব দিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

পবিত্র কুরআন ও গবেষণা : পারস্পরিক সম্পর্ক

পবিত্র কুরআনের সাথে গবেষণার ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। একটিকে ছাড়া অন্যটি চিন্তা করা যায় না। আল-কুরআনের অসংখ্য স্থানে বিভিন্ন ভাবে মানুষকে গবেষণার প্রতি উদাত্ত আহবান জানানো হয়েছে। একস্থানে বলা হয়েছে, "তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না। এটি যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসত তবে তারা তাতে অনেক অসংগতি পেত।"[৯২] অন্যত্র বলা হয়েছে, "তবে কি তারা এ বাণী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না?"[৯৩] এক দৃষ্টিতে বলা যায় যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সবচেয়ে বড় জ্ঞান ও গবেষণাগ্রন্থ। আল-কুরআনের পুরোটাই গবেষণার কথায় ভরপুর।

আল-কুরআনের নামসমূহ : এছাড়া আল-কুরআনের বিভিন্ন নাম এবং সেগুলোর অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও বুঝা যায় যে, পবিত্র কুরআন গবেষণা করার জন্যই অবতীর্ণ করা হয়েছে। যেমন-

- القران 'আল-কুরআন' অর্থাৎ পঠিত এবং বার বার পাঠ করা হয় যে গ্রন্থ। গবেষককে একটি বিষয় নিয়ে বার বার অধ্যয়ন করতে হয়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে القران শব্দটি ৭০ বার ব্যবহৃত হয়েছে।
- الفرقان 'আল-ফুরকান' অর্থাৎ পার্থক্যকারী, যা সত্যকে অসত্য হতে পৃথক করে দেয় ইত্যাদি। গবেষক গবেষণা করে এ কাজটি করে থাকেন। আল-কুরআনে الفرقان শব্দটি ৬ বার এসেছে।

---

৯০. আর-কুরআন, ৪৯:১২ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ

৯১. আল-কুরআন, ১৭:৩৬ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

৯২. আল-কুরআন, ৪:৮২ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً

৯৩. আল-কুরআন, ২৩:৬৮ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ

- المبين 'আল-মুবীন' অর্থাৎ সুস্পষ্ট, প্রকাশ্য, প্রকাশিত, প্রকাশকারী। আল-কুর'আনের সকল কিছু প্রকাশ্য। এতে সকল সত্য প্রকাশিত। এটি সত্য প্রকাশকারী। আল-কুরআন সকল কিছু প্রকাশ করে দেয়, এতে কোন ধরনের বক্রতা নেই। ঐ শব্দটি কুরআনে ১১৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, "এটি তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।"[১৪]
- الذكر 'আয-যিকর' অর্থাৎ স্মরণ, স্মরণিকা, স্মারক, আলোচনা ইত্যাদি। আল-কুর'আনে শব্দটি ৬৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে।
- الحكيم 'আল-হাকীম' অর্থাৎ প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানগর্ভ, সারগর্ভ, জ্ঞানভাণ্ডার, বিজ্ঞানময়। কুরআনকে জ্ঞানভাণ্ডার নাম দেয়া হয়েছে এ থেকে অনুমেয় যে কুরআন গবেষণার দাবি রাখে। এ শব্দটি কুরআনে ৯৭ বার ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের।"[১৫]
- الهدى 'আল-হুদা' অর্থাৎ পথনির্দেশ, পথপ্রদর্শক, পথপ্রদর্শনকারী, দিশারী ইত্যাদি। গবেষকরা পরবর্তীদের জন্য পথপ্রদর্শক। তারা তাদের গবেষণার মাধ্যমে পথ দেখান। কুরআনে শব্দটি ৭৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, "এটি সেই কিতাব; এতে কোন সন্দেহ নেই। মুত্তাকীদের জন্য এটি পথনির্দেশ।"[১৬]
- النور 'আন-নূর' অর্থাৎ আলো, আলোকবর্তিকা, জ্যোতি, বাতি ইত্যাদি। গবেষণা ও গবেষক একার্থে আলো। কারণ তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে আলোর স্ফুরণ ঘটান। শব্দটি আল-কুরআনে ৩৩ বার এসেছে। যেমন বলা হয়েছে, "হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি।"[১৭]
- البرهان 'আল-বুরহান' অর্থাৎ প্রমাণ, দলীল ইত্যাদি। শব্দটি আল-কুরআনে ৭ বার ব্যবহৃত হয়েছে।
- البينات 'আল-বায়্যিনাত' অর্থাৎ স্পষ্ট প্রমাণ। শব্দটি আল-কুরআনে ৫২ বার ব্যবহৃত হয়েছে।
- الموعظة 'আল-মাওইযা' অর্থাৎ উপদেশ। শব্দটি আল-কুরআনে ৯ বার এসেছে।
- البيان 'আল-বায়ান' অর্থাৎ বর্ণনা, বিবরণ ইত্যাদি। গবেষণার সাথে বর্ণনার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।
- المصدق 'আল-মুসাদ্দিক' অর্থাৎ সমর্থক, সত্যতা প্রমাণকারী, সত্যায়নকারী ইত্যাদি।

---

[১৪]. আল-কুরআন, ৩৬:৬৯ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ

[১৫]. আল-কুরআন, ৩৬:২ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

[১৬]. আল-কুরআন, ২:২ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

[১৭]. আল-কুরআন, ৪:১৭৪ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

উপরন্তু আল-কুরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে যাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গবেষণার কথা আলোচিত হয়েছে। কিছু আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে গবেষণা করার জন্য সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন, কিছু আয়াতে এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং কিছু আয়াতে উৎসাহিত করেছেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ নুরুল আমীন এ প্রসঙ্গে বলেন, "কুরআনুল কারীমের অন্যূন সাত শতাধিক আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অর্জন ও এ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার নির্দেশ দিয়েছেন"।[৯৮]

পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে এমন বর্ণনা এসেছে, "তবুও কি তোমরা চিন্তা করবে না?"[৯৯]

"বলুন, তবুও কি তোমরা চিন্তা করবে না?"[১০০]

"এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা আকলকে কাজে লাগাও"।[১০১]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা সকল কিছুর বর্ণনা অল্প কথায় যেভাবে দেয়া যায় সেভাবে দিয়েছেন। অর্থাৎ গবেষণার অবকাশ রেখেছেন, যাতে মুসলিম জাতি অলস হয়ে না যায়। বুদ্ধিমান লোকেরা যেন শুধু নিদর্শন দেখে গবেষণা করে এর গুঢ় রহস্য বের করতে পারে। আল্লাহ বলেন,

"তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে"।[১০২]

"হে রসূল, তুমি লোকদেরকে কাহিনীসমূহ বলতে থাক, সম্ভবত তারা এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করবে"।[১০৩]

এ আয়াতদ্বয় হতে ভূগোল ও ইতিহাস গবেষণার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সূরা আর-রূমের ২০ থেকে ২৫ নং আয়াত থেকেও গবেষণার নির্দেশ ও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন:

> "তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন- তারপর তোমরা মানুষ হিসেবে ছড়িয়ে পড়লে। আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী আছে। তাঁর আর এক নিদর্শন

---

৯৮. মুহাম্মদ নুরুল আমিন, বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান, ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০০২, পৃ. ২৪।

৯৯. আল-কুরআন, ২:৪৬,৭৬ أفلا تعقلون

১০০. আল-কুরআন, ২৩:৮৫ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

১০১. আল-কুরআন, ২৪: ৬১ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

১০২. আল-কুরআন, ৩:১৩৭ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

১০৩. আল-কুরআন, ৭:১৭৬ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

> হচ্ছে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। তাঁর আরও নিদর্শন তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান ভয় ও ভরসার জন্য এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অত:পর দ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। তাঁর অন্যতম নিদর্শন হল-তারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। অত:পর যখন তিনি মাটি থেকে উদ্ধারোর জন্য তোমাদের ডাক দিবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে।"[১০৪]

এভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মহাকাশ, পদার্থবিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা, ভূগোল ও ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে বলেছেন।

আল-কুরআন পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে যে, প্রত্যেকটি বস্তুকে সৃষ্টি করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল মানব জাতির কল্যাণ সাধন। এ প্রেক্ষিতে কুরআনে বলা হয়েছে,

"তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।"[১০৫]

পবিত্র কুরআনে এই আয়াতটিকে সকল গবেষণা ও উন্নতির মূল উৎস বা প্রাণকেন্দ্র বলা যায়। ব্যাখ্যা এভাবে করা যেতে পারে।

(ক) সৃষ্টি জগতে যা কিছু আছে সবই মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।
(খ) মানুষ তার প্রয়োজন অনুযায়ী সৃষ্টির উপাদানগুলোর সঠিক ব্যবহার করবে।
(গ) প্রাকৃতিক পদার্থসমূহ ব্যবহার করতে গেলেই তাকে ঐসব বিষয়ের উপর জ্ঞানার্জন করতে হবে। এভাবে সে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উন্নতি সাধন করবে।
(ঘ) সর্বোপরি মানুষ প্রাকৃতিক বস্তুর উপর গবেষণার মাধ্যমে তার স্রষ্টাকে চিনতে পারবে এবং
(ঙ) ইহকাল ও পরকাল তথা জীবনের সর্বস্তরে তার মঙ্গল সাধিত হবে।

---

১০৪. আল-কুরআন, ৩০:২০-২৫

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ- وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ- وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ- وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ

১০৫. আল-কুরআন, ২:২৯ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

অতএব পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহ্ মানুষের কল্যাণের জন্য দিয়েছেন, এসব বস্তুকে কল্যাণে আসার মত অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য গবেষণা করতে হবে এর বিকল্প নেই।

গবেষণা শব্দটি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে খুব গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। গবেষণার জন্য নিম্নোক্ত শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে- যেমন:

(১) (ক) فَكَّرَ শব্দটি ১ স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে- আল-কুরআন, ৭৪:১৮
(খ) تفكر "তোমরা গবেষণা করবে" আল-কুরআন, ৩৪:৪৬
(গ) تتفكرون আল-কুরআন, ২:২১৯, ২৬৬
(২) يتدبرون শব্দটি ২ স্থানে এসেছে। ৪:৮২ ও ৪৭:২৪
(৩) (ক) عبرة শব্দটি ৬ স্থানে উল্লেখিত হয়েছে, তাহলো ৩:১৩, ১২:১১১, ১৬:৬৬, ২৩:২১, ২৪:৪৪, ৭৯:২৬
(খ) فاعتبروا শব্দটি ১ স্থানে এসেছে, ৫৯:২

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আবুল হাশিমের ভাষায় বলা যায়, আল-কুরআন শাশ্বত এবং সর্বযুগের উপযোগী কিন্তু ইজতিহাদ্ ব্যতীত যুগে যুগে তাকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। বিশ্ব প্রকৃতি এবং মানব প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে আল-কুরআন আমাদেরকে দিয়েছে কতকগুলো মৌলিক নীতি এবং এই নীতিগুলোকে সামনে রেখে ইজতিহাদের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব দিয়েছেন মানুষের বুদ্ধির উপর। রূপান্তরিত অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তির এই ব্যবহারকেই ইজতিহাদ বলে। ইজতিহাদের আসল অবলম্বন আল-কুরআন।[১০৬]

গবেষণার বিষয়

কোন কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে হবে সে ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে ধারণা ও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বর্তমানে যে সব বিষয়ে গবেষণা হয় তার প্রত্যেকটির ব্যাপারে ইসলাম তাকীদ দিয়েছে। যেমন-

শরীরবিদ্যা (physiology) : বর্তমানে মানুষ এ বিদ্যায় উচ্চ শিখরে পৌঁছেছে। যে দিকে ইসলাম বহু পূর্বেই ইঙ্গিত করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা কি তোমাদের নিজেদের দিকে তাকাবে না?"[১০৭] আলোচ্য আয়াত দ্বারা মানববিদ্যা, জীববিদ্যা, শরীরবিদ্যা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। আল-কুরআনে আরো বলা হয়েছে, "তিনি শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।"[১০৮]

---

[১০৬]. আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

[১০৭]. আল-কুরআন, ৫১:২১ وفي أنفسكم أفلا تبصرون

[১০৮]. আল-কুরআন, ১৬:৪ خلق الإنسان من نطفة

মহাকাশ গবেষণা (Astronomy) : মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বহুস্থানে মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করতে বলা হয়েছে। যেমন- বলা হয়েছে, "আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করে ও বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটি নিরর্থক সৃষ্টি করোনি, তুমি পবিত্র।"[১০৯] আলোচ্য আয়াতে অনেকগুলো বিষয়ে গবেষণার কথা বলা হয়েছে। যেমন-আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টি, পৃথিবীর সৃষ্টি, দিন-রাতের পরিবর্তন ইত্যাদি।

ভূগোল ও পরিবেশ গবেষণা (Geography) : নিম্নোক্ত আয়াতে অনেকগুলো বিষয়ে গবেষণার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, যা মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ হতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তরণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"[১১০] অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন, "নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশ হতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে ও বায়ুর পরিবর্তনে।"[১১১] অন্যত্র বলা হয়েছে, "তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার এবং পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহও। আর ওরা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়।"[১১২]

---

[১০৯]. আল-কুরআন, ৩:১৯০-১৯১ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ

[১১০]. আল-কুরআন, ২:১৬৪

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

[১১১]. আল-কুরআন, ৪৫:৫

وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

[১১২]. আল-কুরআন, ১৬:১৫-১৬

وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ- وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

প্রাণীবিদ্যা (Zoology) : নিম্নোক্ত আয়াতে প্রাণীবিদ্যাসহ কয়েকটি বিভাগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছে। যেমন- মহাকাশ, ভূগোল ও পরিবেশ (Geography & Environment), ভূতত্ত্ব (Zoology), মৃত্তিকা বিজ্ঞান (Soil Science) ইত্যাদি। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের দিকে, কিভাবে তাকে ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে? এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে? এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে তাকে বিস্তৃত করা হয়েছে?"[১১৩] উটের সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করলে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসে। যেমন- উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়। কারণ উট ছাড়া আর কোন প্রাণী দীর্ঘ মরুভূমি পার হতে পারে না। উট বহুদিন পানি আটকে রাখতে পারে। যা অন্য কোন প্রাণী পারে না। অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের সৃজনে এবং জীবজন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য।"[১১৪] আরো প্রত্যক্ষভাবে বলা হয়েছে,

> "তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য এতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং তা হতে তোমরা আহার করে থাক। এবং তোমরা যখন গোধূলি লগ্নে ওদেরকে চারণভূমি হতে গৃহে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন ওদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা তার সৌন্দর্য উপভোগ কর এবং ওরা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় এমন দেশে যেথায় প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, খচ্চর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা অবগত নও।"[১১৫]

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে কয়েকটি বিষয় নিয়ে গবেষণার কথা বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে- (১) পশুর অংশ থেকে শীত নিবারক উপকরণ পাওয়া যায়। যেমন- পশম থেকে পোশাক, কম্বল, জুতা ইত্যাদি পাওয়া যায়। পশুর দুধ খেলে শক্তি বৃদ্ধি

---

১১৩. আল-কুরআন, ৮৮:১৭-২০

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ - وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ - وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ - وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

১১৪. আল-কুরআন, ৪৫:৪ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

১১৫. আল-কুরআন, ১৬: ৫-৮

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

পায়। এতে শীত ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। (২) তাছাড়া অন্যান্য উপকার রয়েছে। যেমন- পেশাব দিয়ে ঔষধ, পায়খানা দিয়ে জৈব সার, শিং দিয়ে চিরুনী ইত্যাদি। (৩) আহারের বস্তু পাওয়া যায়। যেমন- গোশ্‌ত, দুধ ইত্যাদি। (৪) বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। যেমন- চিড়িয়াখানা, সাফারি পার্ক, পশুর উপর ভিত্তি করে টিভি চ্যানেল। যথা- এ্যানিমেল প্লানেট, ডিসকভারি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল। (৫) কয়েকটি জন্তু ভারবহন করে থাকে। যেমন- গাধা, ঘোড়া, উট, হাতি ইত্যাদি। বিশেষত কিছু দুর্গম স্থান রয়েছে যেখানে অন্য কোনভাবে গমন করা সম্ভব নয়। যেমন- মরুভূমিতে উটের বিকল্প আজ অবধি পাওয়া যায়নি। পাহাড় বা ঐ ধরনের সংকটময় উঁচু-নীচু পথে যাতায়াতের জন্য পশুর বিকল্প নেই।

এসব উপকারিতা গবেষণার মাধ্যমেই জানা গেছে। ভবিষ্যতে গবেষণার মাধ্যমে এমন সব উপকারের কথা জানা যাবে যা মানুষ আপাতত জানে না।

উদ্ভিদ গবেষণা : উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার জন্য কুরআন ও হাদীসে প্রচুর ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন এক স্থানে বলা হয়েছে, "তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন। এতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা হতে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক। তিনি তোমাদের জন্য এর দ্বারা জন্মান শস্য, যায়তুন, খর্জুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে"।[১১৬]

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু নিয়ে গবেষণা করা : মহাবিশ্বের সব কিছু নিয়ে গবেষণা করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, গবেষক সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।"[১১৭] মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, "বল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ কর। নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।"[১১৮] আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন, "তারা কি লক্ষ করে না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সম্পর্কে এবং এর সম্পর্কেও যে, সম্ভবত তাদের

---

১১৬. আল-কুরআন, ১৬:১০-১১

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

১১৭. আল-কুরআন, ৪৫:১৩

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

১১৮. আল-কুরআন, ১০:১০১

قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ

নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী সুতরাং এর পর তারা আর কোন কথায় ঈমান আনবে।"[১১৯] মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, "ওরা কি নিজেদের অন্তরে চিন্তা-গবেষণা করে দেখে না? আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্ট কালের জন্য।"[১২০]

কৃষি গবেষণা (Agriculture) : কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্থানে কৃষি ও কৃষি গবেষণার কথা বলা হয়েছে। যেমন এক স্থানে বলা হয়েছে, "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসা সঞ্চারকরূপে এবং আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন ও তদ্বারা ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর; এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য।"[১২১]

ইতিহাস গবেষণা (Histor) : মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বহুস্থানে ইতিহাস নিয়ে গবেষণার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেমন এক স্থানে বলা হয়েছে, "আমি তাদের উপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা লক্ষ কর।"[১২২]

ভাষা গবেষণা (Language) : ভাষা মহান আল্লাহর এক বিশাল নিআমত। বিশ্বের বহু ভাষার মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্য রয়েছে। ভাষা নিয়ে গবেষণা করার জন্য মহান আল্লাহ্ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে বিশ্ববাসীর জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।"[১২৩] ভাষা গবেষণায় দেখা যাবে যে, ইসলামে মাতৃভাষার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ্ কিতাব ও রসূল পাঠিয়েছেন স্বজাতির ভাষায়। কারণ মাতৃভাষায় কোন কিছু যেভাবে আত্মস্থ করা যায় তা অন্য ভাষায় পারা যায় না। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আমি প্রত্যেক রসূলকে তার স্বজাতির

---

[১১৯]. আল-কুরআন, ৭:১৮৫

أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

[১২০]. আল-কুরআন, ৩০:৮

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى

[১২১]. আল-কুরআন, ৩০:২৪

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

[১২২]. আল-কুরআন, ৭:৮৪ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

[১২৩]. আল-কুরআন, ৩০:২২

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ

ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।"[১২৪] মুহাম্মদ স. কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে।"[১২৫]

পর্যটন গবেষণা : বর্তমান যুগে পর্যটন যে কোন দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এর সাথে অর্থনীতি, সংস্কৃতি, বিনোদনসহ অনেক কিছু জড়িত। অনেক দেশ এ বিষয়ে গবেষণা করে বিষয়টিকে দেশের জাতীয় আয়ের প্রধান মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নেপালের কথা উল্লেখ করা যায়। পরিকল্পিত উপায়ে দেশের দর্শনীয় স্থানগুলোকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলা যায়। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা এর দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর" ।[১২৬]

সমুদ্র বিজ্ঞান : সমুদ্র মহান স্রষ্টার আশ্চর্য সৃষ্টি। গবেষণার ফলে দেখা যাচ্ছে এতে মানুষের জন্য উপকারী হাজারো উপকরণ রয়েছে। ইসলাম সমুদ্র নিয়ে গবেষণার প্রতি জোর দিয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে, "তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তা হতে তাজা মৎস্য আহার করতে পার এবং যাতে তা হতে আহরণ করতে পার রত্নাবলী যা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর এবং তোমরা দেখতে পাও, এর বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং তা এজন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার।"[১২৭] সর্বোপরি জীবন ও জগতের এমন কোন গবেষণা নেই যার কথা ইসলামে আলোচিত হয়নি।

গবেষণার পরিধি

ইসলাম মানুষকে গবেষণার নির্দেশ দিয়েছে এবং সাথে সাথে এর ক্ষেত্রও চিহ্নিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ মানুষ গবেষণা করতে পারবে শুধু কল্যাণের জন্য। যেমন মহান আল্লাহর বাণী, "তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।" এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তাআলা সবকিছু মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতএব, সৃষ্টবস্তু থেকে কল্যাণ লাভের জন্যে গবেষণা করতে

---

[১২৪]. আল-কুরআন, ১৪:৪ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

[১২৫]. আল-কুরআন, ৪৪:৫৮ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

[১২৬]. আল-কুরআন, ৬৭:১৫ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ

[১২৭]. আল-কুরআন, ১৬:১৪

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ

হবে। কিন্তু যে গবেষণার ফল মানুষের অকল্যাণ বয়ে আনে তা করা যাবে না। যেমন- ব্যাপক ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র তৈরীর জন্য গবেষণা।

ইসলাম মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টিজগৎ নিয়ে গবেষণা করতে বলেছে কিন্তু স্রষ্টা সম্পর্কে গবেষণা করতে নিষেধ করেছে। হাদীসে এসেছে, "তোমরা সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা কর এবং স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা করো না কারণ তোমরা আল্লাহকে গণ্ডিতে আবদ্ধ করতে পারবে না"।[১২৮] কেননা আল্লাহর সত্তা ও তাঁর গুণাবলীর তাৎপর্য অনুভব করা মানব বুদ্ধির বহু উর্ধ্বে। এতে চিন্তা গবেষণা করার ফল হতভম্বতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মোটকথা, গবেষণা করার একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে। সবকিছু নিয়ে গবেষণা চলে না, তা সফলও হতে পারে না। যেমন- স্রষ্টাকে নিয়ে। বরং সৃষ্টিকে নিয়ে যত সম্ভব গবেষণা করা যেতে পারে। আর এ ধরনের গবেষণা ইবাদত তুল্য।[১২৯] মহান আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে যত বেশি গবেষণা করা যাবে; মানুষের তত বেশি কল্যাণ সাধিত হবে। আর মহান আল্লাহকে নিয়ে গবেষণা মানুষের এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ। এতে মানুষের জন্য ক্ষতি রয়েছে। এমনকি তা মানুষের পতনও ডেকে আনতে পারে। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "তোমরা আল্লাহর সৃষ্টিলোক সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা কর, কিন্তু আল্লাহর নিজ সত্তা সম্পর্কে গবেষণা করতে যেও না। কেননা তাহলে তোমরা ধ্বংস হবে।"[১৩০]

গবেষণার পদ্ধতি

ইসলামে গবেষণার কিছু পদ্ধতি রয়েছে। যেমন-

পারস্পরিক সহযোগিতা : গবেষণায় পারস্পরিক সহযোগিতা খুব ফলপ্রসূ হয়। একাধিক গবেষকের মতামত একত্র হলে অনেক নতুন আবিষ্কার সম্পন্ন হয়। এ জন্য দেখা যায়, বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাজনক পুরস্কারগুলোতে বিভিন্ন শাখায় একই বছর একাধিক ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা হয়। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর"।[১৩১]

যৌথ গবেষণা : আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে, গবেষণার স্বার্থে একজন বা দু'জন মিলে যৌথভাবেও গবেষণা করা যায়। এতে কোন সমস্যা নেই। বরং সত্য প্রকাশে

---

[১২৮]. অধ্যাপক মুহাম্মাদ আলী আস-সাবূনী, *সাফওয়াতুত তাফাসীর*, বৈরূত: দারুল কুরআন আল-কারীম, ১৯৮১ খ. ১, পৃ. ২৫৪ تفكروا فى الخلق ولاتفكروا فى الخالق فانكم لاتقدرون الله قدره

[১২৯]. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

[১৩০]. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮০, পৃ. ৬৪

[১৩১]. আল-কুরআন, ৫:২ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

এ পদ্ধতি আরো বেশি কার্যকর। মহান আল্লাহ্ বলেন, "বল, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই-দুইজন অথবা এক-একজন করে দাঁড়াও অতঃপর তোমরা চিন্তা-গবেষণা করে দেখ, তোমাদের সংগী আদৌ উন্মাদ নয়। সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।[১৩২] ইসলামের 'শুরা' (পারস্পরিক পরামর্শ) ব্যবস্থা যৌথ গবেষণারই একটি পর্যায়। শূরা বা পরামর্শ করে কাজ করার জন্য আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।"[১৩৩] আরো বলা হয়েছে, "তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে।"[১৩৪]

সার্বক্ষণিক গবেষণা : ইসলামে গবেষণা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, তা শুধু ঘটা করেই করা হবে না। বরং সর্বদা গবেষণায় নিজেকে জড়িয়ে রাখতে হবে। যে অবস্থায় থাকবে সে অবস্থায়ই চিন্তা-গবেষণা করবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটি নিরর্থক সৃষ্টি করোনি, তুমি পবিত্র।"[১৩৫] আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সার্বক্ষণিক গবেষণার মাধ্যমে মানুষ প্রতিটি সৃষ্টির যৌক্তিকতা খুঁজে পায়। পরিশেষে সে মহান আল্লাহর পবিত্রতা উপলব্ধি করতে পারে। তাছাড়া এ কথাও বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ্ তিনটি অবস্থার কথা বলেছেন। এর বাইরেও যে কোন অবস্থায় গবেষণা হতে পারে। বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও গবেষক ইংল্যান্ডের অধিবাসী স্টিভেন হকিংস কথা বলতে পারেন না। কিন্তু তার গবেষণা থেমে নেই। তিনি ইশারা ইঙ্গিতে মানুষকে গবেষণায় সহায়তা করছেন।

স্থায়ী গবেষণা : এমনভাবে এবং এমন বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে হবে যার ফল বহুদিন অবশিষ্ট থাকে। গবেষণায় সাময়িক সুবিধার কথা ভাবা যায় না। টেকসই গবেষণা করতে হবে। ইসলামের বক্তব্য সে ধরনেরই। নিম্নোক্ত হাদীস হতে সে

---

১৩২. আল-কুরআন, ৩৪:৪৬

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

১৩৩. আল-কুরআন, ৩:১৫৯ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

১৩৪. আল-কুরআন, ৪২:৩৮ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

১৩৫. আল-কুরআন, ৩:১৯১

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ

ধারণাই পাওয়া যায়। হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা আলী রা. কে রসূলুল্লাহ্ স.-এর চুপ থাকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, "রসূলুল্লাহ স.-এর চুপ থাকা ছিল চারটি কারণে"-

এক. সহনশীলতার কারণে,

দুই. সাবধানতার দরুন,

তিন. আন্দাজ করার উদ্দেশ্যে ও

চার. চিন্তা-ভাবনা করার জন্য। তাঁর আন্দাজ করা ছিল অবস্থার উপর পূর্ণ চিন্তা-ভাবনা করা এবং মানুষের আলাপ-আলোচনা শ্রবণ করা। আর তিনি চিন্তা-ভাবনা করতেন সেসব বিষয়ে, যা অবশিষ্ট থাকে এবং বিলীন হয় না।'[১০৬] এ হাদীস থেকে অনুমিত হলো, গবেষণা যাতে বহুদিন মানুষকে উপকৃত করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, শুধু ডিগ্রি অর্জনই যেন উদ্দেশ্য না হয়। বরং সর্ব সাধারণের উপকারের দিকে খেয়াল রেখেই গবেষণা করতে হবে।

জ্ঞানীদের প্রশ্ন করা : সব কিছু সবাই জানে না। এটি সম্ভবও নয়। অতএব যারা যে বিষয়ে বেশি জানে গবেষণার স্বার্থে তাদের কাছে যেতে হবে এবং প্রশ্নের মাধ্যমে ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানতে হবে। এসব আধুনিক গবেষণারও পদ্ধতি। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞাসা কর"।[১০৭] অতএব বিশেষজ্ঞদের কাছে যেতে হবে। মহান আল্লাহ্ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জেনে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

ইসলামের সোনালী যুগে গবেষণা

মহানবী স. নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি জ্ঞান-গবেষণায় মনোযোগী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা শিবলী নুমানী বলেন, প্রশ্ন করা হয়েছিল, "তিনি কি ইবাদত করিতেন? তিনি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলস্থিত সৃষ্ট পদার্থসমূহ নিরীক্ষা করিয়া আল্লাহর অস্তিত্বের গবেষণা ও ধ্যান করিতেন।"[১০৮] বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির বলেন, "শরীয়তের বিধান সম্পর্কিত গবেষণার ব্যাপারে

---

[১০৬]. *আখলাকুননবী স.* প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১ عن الحسن بن على بن ابى طالب رض قال سألت ابى فسألت كيف كان سكوت رسول الله ص؟ قال: كان سكوت رسول الله ض على اربع على الحلم والحذر والتقدير والتفكير فأما تقديره ففى تسوية النظر والاستماع من الناس وأما تفكيره ففيما يبقى ولايفنى

[১০৭]. আল-কুরআন, ১৬:৪৩ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

[১০৮]. শিবলী নুমানী, *সীরাতুননবী*, আযমগড়: মাতবা মাআরিফ, ১৯৫২, পৃ. ২০১
ما كان صفة تعبده اجيب بأن ذالك كان بالتفكر والاعتبار

আমরা মুহাম্মদ স.-এর জীবনকাল হতে আজ পর্যন্ত সর্বকালেই ইজতিহাদের অস্তিত্ব দেখতে পাই। রসূলুল্লাহ স. মহান আল্লাহর ওহী পেয়ে সমস্ত শরয়ী সমস্যার সমাধান করতেন। তা সত্ত্বেও কখনও কখনও কোন কোন বিষয় ওহী না পাওয়া পর্যন্ত তিনিও ইজতিহাদ করতেন। যেমন আবু দাউদ শরীফের এক রিওয়ায়েতে আছে–

"নবী স. দুই ব্যক্তির মধ্যকার বিবাদ-বিবাদ মীমাংসা করার সময় বলেছেন, "..... এ বিষয়ে আমার রায় প্রয়োগ করেই আমি তোমাদের মীমাংসা করে দেবো।"[১৩৯]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন-সুন্নাহয় যে বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না সেখানে যথা নিয়মে ইজতিহাদ প্রয়োগ বৈধ।[১৪০] মহানবী স. জীবনে বহুবার গবেষণা করে অনেক দুরূহ কাজকে সহজ সাধ্য করেছিলেন। নবুওয়াত লাভের পূর্বে হেরা গুহায়ও তিনি গবেষণাই করছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ সফলও হয়েছিলেন। এছাড়া বদর যুদ্ধের কৌশল ও স্থান নির্বাচন, আহযাবের যুদ্ধে মদীনাকে সুরক্ষার জন্যে পরিখা খনন, মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য বুঝানোর জন্য অগ্নি প্রজ্বলন ইত্যাদিও তাঁর গবেষণার নিদর্শন।

রসূল স.-এর সাহাবাগণও তাঁদের সময়ে ইজতিহাদের ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন; যা মুআয ইবন জাবাল বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়। উমর রা. তাঁর খেলাফতকালে কুফার শাসক আবু মূসা আল-আশআরীকে লিখেছিলেন: "যে ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কোন নির্দেশ নেই সেরূপ ব্যাপারে যখন তোমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় তখন তুমি ব্যাপারটির রকম ও প্রকৃতির সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা করবে এবং তার কোন নযীর আছে কিনা অনুসন্ধান করবে। অতঃপর সে সকল নযীরকে সামনে রেখে এর হুকুম দিবে এবং সব সময় আল্লাহর নিকট কোনটি পছন্দনীয় তা লাভ করতে সচেষ্ট হবে।"[১৪১]

আরেক বার, এক মহিলার মোহর সংক্রান্ত সমস্যার ফায়সালার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর কাছে গেলে তিনি উপস্থিত সাহাবীগণের সামনে বললেন, "এখন আমার রায় (মতামত) নিয়ে ইজতিহাদ করা ছাড়া আর কোন পথ দেখছি না। কারণ কুরআন-সুন্নাহর এরূপ কোন স্পষ্ট হুকুম পাওয়া যাচ্ছে না। আমি যদি এই রায়

---

[১৩৯]. শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ আততিবরিযি, *আল-মিশকাত আল মাসাবীহ*, দিল্লী: কুতুবখানা রশিদিয়া, ১৯৫৬, পৃ. ৩২৭

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اقضى بينكما برائى فيما لم ينزل على فيه

[১৪০]. অধ্যক্ষ শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির, *ইসলামে ইজতিহাদের স্থান*, গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

[১৪১]. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

প্রয়োগ করে সঠিক কাজ করি, তবে তার প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য; আর যদি ভুল করি, তবে তা আমার ও শয়তানের ঘাড়ে পড়বে'। উপস্থিত সাহাবাগণ ইবনে মাসউদের এ কথার আর কোন প্রতিবাদ করলেন না। ইবনে মাসউদ র. মহরে মিসালের রায় দিলেন।[১৪২] অর্থাৎ সাহাবাগণ তাঁদের সময়ে ইজতিহাদ করতেন। তবে তা ছিল সীমিত পরিসরে, অল্প সংখ্যকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন অধ্যক্ষ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "সাহাবীগণের যুগে লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে উমর, আলী, যায়দ ইবনে সাবিত, আয়েশা, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, মুআয ইবনে জাবাল, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, আবু বকর, উসমান, আবু মুসা আল-আশআরী রা. প্রমুখ অল্প সংখ্যক সাহাবীকেই মাত্র ফতোয়া ও ইজতিহাদের কাজ করতে দেখেছি। এদের বাইরে যে লক্ষাধিক সাহাবী ছিলেন তাদেরকে ইজতিহাদ ও ফতোয়ার কাজে তেমন অগ্রসর হতে দেখা যায়নি।[১৪৩]

সাহাবীগণের যুগের পরে ইজতিহাদের ব্যাপক প্রসার ও চর্চা ঘটে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতকালে। তখন মুসলিম এলাকার ব্যাপ্তি বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন জাতির সঙ্গে মুসলমানদের মেলামেশায় এবং নবুওয়াতের যুগ দূরে সরে পড়ায় অনেক নতুন দীনী ও সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। বিজাতির সাথে ক্রয়-বিক্রয়, আদান-প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ-শাদী, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধিকতর অনুষ্ঠিত হতে থাকে বলে অধিকতর ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব হয়। ফলে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী মাযহাবসহ আরো অনেক মাযহাবের সৃষ্টি হয়।[১৪৪] ইসলামী আইনশাস্ত্রের গবেষণা ছাড়াও সে সময় মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা যেমন- ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, সাহিত্য ইত্যাদিতে গবেষণার মাধ্যমে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। এ সময় বাগদাদ নগরী জ্ঞান সাধনার প্রাণকেন্দ্র রূপে গড়ে উঠেছিল। আব্বাসীয় খলীফা মামুনুর রশীদ কর্তৃক বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত 'বাইতুল হিকমা' ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধনে অনন্য ও অনবদ্য। সে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় বিশেষত: গ্রীসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান ভাণ্ডারকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য ৯০ জন পণ্ডিত সার্বক্ষণিক নিয়োজিত ছিলেন। গবেষকদের উৎসাহিত করার জন্য মূল গ্রন্থাবলির সম ওজনে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করার নিয়ম ছিল।[১৪৫] বাগদাদ ছাড়াও গবেষণার পাদপীঠ

---

[১৪২]. আল্লামা আবুল বারাকাত নাসাফী, *নূরুল আনওয়ার*, ইজতিহাদ অধ্যায়, পৃ. ২৪৬

[১৪৩]. অধ্যক্ষ শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির, পৃ. ৪৩

[১৪৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

[১৪৫]. মাওলানা মোঃ আবদুন নূর, *জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা: মাসিক মেদায়ে ইসলাম, ৬২ বর্ষ, সংখ্যা-১০, ২০০৩, পৃ. ২৮

হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল কুফা, বসরা, নিশাপুর, বোখারা, দামেশক, মক্কা, মদীনা, কর্ডোভা, কায়রো, সিসিলি ইত্যাদি শহর। এসময়ে গবেষণার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক, আব্দুর রহমান আন-নাসির, আব্বাসীয় খলীফা হারুন-অর-রশীদ, তাঁর পুত্র মামূনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ যুগের উল্লেখযোগ্য গবেষক ও গবেষণাকর্ম হল চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইবনে সীনা (৯৮০-১০৩৭)-এর আল-কানুন ফিত-তীব, আবুল কাশেম যাহরাবীর আত-তাসরীক, দৃষ্টিবিজ্ঞানে হাসান ইবনে হাইসাম (৯৬৫-১০৩৯)-এর কিতাবুল মানাযির, ভূগোল শাস্ত্রে আল বাকরীর, 'কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক ইত্যাদি। রসায়ন বিজ্ঞানের জনক হিসেবে জাবির ইবনে হাইয়ান, গণিতে আল-খাওয়ারেজমী (৭৮০-৮৫০), জ্যোর্তিবিজ্ঞানে অবদানের জন্য আল-বিরুনী (৯৭৩-১০৪৮) বিখ্যাত ছিলেন। এছাড়া আরো প্রণিধানযোগ্য গবেষক হলেন- ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, ওমর খৈয়াম (১০৩৮-১১২৩), আত-তাবারী (৮৩৮-৯২৩), নাসিরউদ্দীন তুসী (মৃ.১২৭৪খৃ.), ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬), আল-গাযালী (১০৫৮-১১১১), ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৬৯) প্রমুখ। তাছাড়া আবূ বকর আল-রাযী (৮৬৫-৯২৫), আল-কিন্দি (৮০২-৮৭৩), আল-ফারাবী (৮৭০-৯৫০), ইবনে তুফায়েল (মৃ.১১৮৫), ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৮), আল-মাসউদী (৯১২-৯৫৭), সাবিত ইবনে কুররা (৮২০-৯০১), আল-বাত্তানী (৮৫৮-৯২৯), আল-ইদরিসী (১০৯৯-১১৬৬) নিজ নিজ শাখায় স্বমহিমায় চিরভাস্বর হয়ে আছেন।

পরবর্তীতে আরো কিছু সংখ্যক গবেষক তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন। বিশেষ করে ভারতবর্ষে শাহ ওয়ালী উল্লাহ র.-এর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর গবেষণা প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল আলা র. বলেছেন, গবেষণার সংজ্ঞা, গুরুত্ব, জোর প্রদান, সংবিধান, শর্তাবলী, নীতি-নিয়ম ও এ বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি সারাটি জীবন জ্ঞান-গবেষণায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। এ ধরনের গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হলো- (১) ইযালাতুল খাফা, (২) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, (৩) ইকদুল জীদ, (৪) ইনসাফ ফুদুরে বাজিগাহ, (৫) মুসাফফা প্রভৃতি।[১৪৬]

---

[১৪৬]. সাইয়েদ আবুল আলা, শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভীর কার্যাবলী, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রনায়ক শাহ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী স্মরণিকা ২০০৩*, ঢাকা: শাহ ওয়ালী উল্লাহ ইসলামিক সেন্টার বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ. ৩২

মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ

বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের যে পশ্চাৎপদতা ও অধঃপতন এর মূল কারণ হল, বুদ্ধিবৃত্তির যথাযথ ব্যবহার না করা। এ কারণেই তারা আজ পৃথিবীতে নির্যাতিত হচ্ছে, নিষ্পেষিত হচ্ছে এবং এ থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। কেননা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার না করলে এবং নিজের চিন্তাশক্তিকে কাজে না লাগালে মানুষ অলস হয়ে যায়। তাদের অন্তরে মরিচা পড়ে।

এছাড়া মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ততার কারণ বর্ণনায় মুফতী মোহাম্মদ শফী র. কর্তৃক সূরা ফুরকানের ৫৯ থেকে ৬৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, এসব আয়াতে মানুষকে বলা উদ্দেশ্য যে, আমি আকাশে বড় বড় নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, এদের মাধ্যমে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন, অন্ধকার আলো এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমগ্র সৃষ্টিজগৎ এ কারণে সৃষ্টি করেছি, যাতে চিন্তাশীলরা এগুলো থেকে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা ও তাওহীদের প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারে এবং কৃতজ্ঞ বান্দারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ লাভ করে। অতএব দুনিয়াতে যে ব্যক্তির সময় চিন্তা-ভাবনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে যায় তার সময় অযথা নষ্ট হয় এবং তার পুঁজিও ধ্বংস হয়ে যায়।

ইবনুল আরাবী বলেন, "সে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, যার বয়স ষাট বছর এবং তার অর্ধেক ত্রিশ বছর নিদ্রায় অতিবাহিত হয়ে যায় ও ছয় ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ দশ বছর দিবাভাগে বিশ্রাম গ্রহণে অতিবাহিত হয়ে অবশিষ্ট মাত্র বিশ বছর কাজে লাগে"।[১৫৭]

উপসংহার

বর্তমানে সারা দুনিয়ায় মুসলিম জাতির যে পশ্চাৎপদতা লক্ষ করা যাচ্ছে, এর অন্যতম প্রধান কারণ জ্ঞান-গবেষণায় পিছিয়ে পড়া। এর প্রতি অনাগ্রহ এবং বস্তুবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়া। অর্থাৎ যতদিন তারা ছিল গবেষক, ততদিন সারা দুনিয়া মুসলমানদের দ্বারা উপকৃত হতো, মুসলমানরা ছিল নেতৃত্বে আর সারা দুনিয়া ছিল তাদের পিছনে। আর আজ ব্যাপারটা হয়েছে উল্টো। অমুসলিমরা পৃথিবীতে প্রথম কাতারে অবস্থান করছে। আর মুসলমানরা তাদের পিছনে দৌড়াচ্ছে। এসবই গবেষণায় পিছিয়ে থাকার ফল। অতএব আবার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে অবশ্যই মুসলমানদেরকে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করতে হবে।

---

১৫৭. মুফতী শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬৪

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮, সংখ্যা-২৯
জানুয়ারী : মার্চ : ২০১২

ব্যবসা-বাণিজ্যে দালালি : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

আকলিমা*
আবু নাঈম মোঃ শহীদুল ইসলাম**

[সারসংক্ষেপ : মানুষ সামাজিক জীব। এ কারণে সামাজিক কর্মকাণ্ডে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং লেনদেন মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্যবসা-বাণিজ্য সামাজিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম অংশ। আধুনিককালে ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের জন্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ই তৃতীয় পক্ষের সহায়তা গ্রহণ করে থাকে যাকে পরিভাষায় 'দালালি' (মধ্যস্থতা) বলা হয়। যারা পণ্য বণ্টন প্রণালীতে উৎপাদক ও ভোক্তাদের মধ্যবর্তী স্থানে থেকে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে এবং কাঁচামাল উৎপাদনকারী ও শিল্পোৎপাদকের মধ্যে কাঁচামাল আদান প্রদান করে থাকে। আধুনিককালে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। ক্রেতাদের সংখ্যা ও বাজারের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন অনেক পণ্য রয়েছে যেগুলোর বাজার বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হয়েছে। এমতাবস্থায় দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ও অগণিত ক্রেতাদের নিকট সরাসরি পণ্যদ্রব্য হস্তান্তর করা উৎপাদনকারীর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। বিধায় উৎপাদককে অপর একদল ব্যবসায়ীর সহযোগিতা গ্রহণ করতে হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে এ ধরনের কর্মকাণ্ড 'দালালি' নামে পরিচিত। এর উদ্দেশ্য ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কে লেনদেনে সহায়তা করা। অথচ বাস্তবে এর দ্বারা ক্রেতা-বিক্রেতা অহরহ নানামুখী ছলচাতুরী ও প্রতারণার শিকার হচ্ছে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা এমন একটি কালজয়ী সর্বজনীন আদর্শ উপস্থাপন করেছে যার আলোকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। আর উক্ত মূল্যবোধই মানুষকে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল লেনদেনে পরস্পরকে সহায়তা করতে উৎসাহিত করে। ইসলামের বাণিজ্যনীতি অনুসরণের মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে মধ্যস্থতা করার বিভিন্ন দিক আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।]

দালালির পরিচয়

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনকে সুখী, স্বাচ্ছন্দ্যময়, ও উপভোগ্য করার জন্য যে সকল নিয়ম-নীতি ও দিকনির্দেশনা প্রয়োজন তার সবগুলোই ইসলামী

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, সরকারি বাংলা কলেজ, ঢাকা।
** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।

জীবন ব্যবস্থায় বিদ্যমান। এ জীবন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ব্যবসা-বাণিজ্য। আধুনিক বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্য মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম মানুষকে স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ দিয়েছে। আধুনিক বাজার ব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দালালি (মধ্যস্থতা) প্রথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার যথাযথ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সময় ও সুযোগ না থাকার কারণে অনেক সময় তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার প্রয়োজন দেখা দেয়। এরূপ মধ্যস্থতা 'দালালি' নামে অভিহিত।

'দালালি' বলতে কমিশনের বিনিময়ে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে সাহায্য করা বোঝায়।[১] যদিও এর পাশাপাশি দালালি শব্দের আরো কিছু অর্থ বিদ্যমান আছে, যেমন সঙ্গতভাবে পক্ষ সমর্থন করা ও অন্যায়ভাবে কাউকে সাহায্য করা। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রথম অর্থটিই গৃহীত।[২]

ইংরেজিতে দালালি শব্দের অর্থ Brokery. যেমন দালাল সম্পর্কে বলা হয়েছে- A person who buys and sells things for other people.[৩]

আরবিতে দালালিকে سمسرة বলে। আর যে দালালি করে তাকে سمسار বলে। যার অর্থ হলো-অভিজ্ঞ, চালাক, বিচক্ষণ। দালালির পরিচয় দিতে গিয়ে মুহাম্মদ রাওয়াস কালজী বলেন- سمسار: وسيط وبائع وشاري وساعي للواحد منهما، فارسي من سمسار.

অর্থ: সিমসার শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে আগত, যার অর্থ- ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী।[৪]

'লিসানুল আরাব' গ্রন্থে এসেছে-

السِّمْسَارُ الذي يبيع البَزَّ للناس الليث السِّمْسَار فارسية معرَّبة والجمع السَّمَاسِرَةُ وفي الحديث أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سماهم التُّجَّار بعدما كانوا يعرفون بالسماسرة وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع قال والسَّمْسَرَةُ البيع والشراء-

---

১. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সম্পা., *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯, পৃ. ৬০১

২. প্রাগুক্ত

৩. Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, Sixth Edition, 2005, p. 159

৪. মুহাম্মদ রাওয়াস কালজী, *মু'জামু লুগাত আল-ফুকাহা*, রিয়াদ: ইহইয়াউত তুরাছিল ইসলামী, তা. বি., খ. ১, পৃ. ১৯

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স. ব্যবসায়ীদের সিমসারও বলেছেন। আর সিমসার হলো সেই ব্যক্তি, যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনের জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে মধ্যস্থতা করে।[৫]

সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, দালালি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের অথবা একজনের সন্তুষ্টির জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করা বোঝায়।[৬] ইসলামের সোনালী যুগে ব্যক্তি পর্যায়ে দালালি বা পরামর্শ প্রদানের প্রচলন থাকলেও বর্তমান যুগে ব্যক্তির পরিবর্তে অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানও দালালির কাজ করে থাকে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে দাম দর ছাড়াও অন্যান্য বিষয় সমাধা করে দেয়। বস্তুত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রকৃতি ও পদ্ধতির ব্যাপকতার কারণে আজ দালালি বিষয়টি ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বার্থ রক্ষার জন্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। যেমন ড. খালিদ ইবনু আলী বলেন-

فهذه دروس في بعض المعاملات المالية المعاصرة التي كثر تعامل الناس بها في هذا الزمن ، وقد تكون هذه المعاملات من المعاملات المستجدة وقد تكون غير مستجدة بل تكلم عليها العلماء رحمهم الله في الزمن السابق —

অর্থাৎ "বর্তমান সময়ে মানুষের মাঝে আধুনিক অর্থনৈতিক লেনদেন বৃদ্ধি পেয়েছে যাতে দালালির মতো বিষয়ের একটা গুরুত্ব আছে। আর কখনও কখনও সে লেনদেনের ধরন নতুন আবার কখনও নতুন নাও হতে পারে, তবে আলিমগণ সে বিক্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন"।[৭]

আল্লাহ তাআলা মানুষকে হিকমত, বিচার বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।[৮] সে যদি তার বৈষয়িক উপার্জনে এ শক্তি ব্যবহার করে তাহলে শরীয়ত তাকে উৎসাহিত করে। ইসলাম ব্যবসাকে হালাল করেছে আর সূদকে করেছে হারাম। মৌলিক ও কাঠামোবদ্ধ ইবাদতের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ বা বন্ধ রাখতে বলা হলেও ইবাদত সম্পাদন হবার পরে তা আবার চালু করার আদেশ দেয়া হয়েছে।[১০] আর বান্দার সকল কাজে স্রষ্টার পক্ষ থেকে সহজতর পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে।[১১]

---

৫. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরাব*, বৈরুত: দার ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৬, খ. ৪, পৃ. ৩৮০

৬. *আল-ফাতাওয়া আল-হিনদিয়া*, ৩য় পরিচ্ছেদ, খ. ২৭, পৃ. ২৬২

৭. ড. খালিদ ইবনু আলী, *আল মুয়া'মালা আল-মালিয়া আল-মুয়া'ছিরা*, সৌদি আরব: ইবনে সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪২৪, পৃ. ২

৮. আল-কুরআন, ২:২৬৯ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

৯. আল-কুরআন, ৬২ : ৯ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

১০. আল-কুরআন, ৬২ : ১০

একথা স্পষ্ট যে, মহানবী স.-এর নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও আজকের বাস্তবতায় তার প্রকৃতি ও পরিধি অনেক ব্যাপক।[১২] যে সকল পদ্ধতিতে প্রাথমিক যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য বৈধ ছিল আজকের দিনে সে সকল পদ্ধতির সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি অবৈধ পন্থার ক্ষেত্রেও নতুন কৌশল তৈরি হয়েছে।

ইসলামী শরীয়তে যা হারাম তা কোনভাবেই হালাল হতে পারে না। যেমন, ইহুদীরা তৎকালীন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ পন্থা অবলম্বন করতো। দাউদ আ. এর সময়ে তাঁর অনুসারীরা শনিবারে মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকায় কৌশলে সব মাছ খালে আটকিয়ে রাখত এবং রবিবার দিন ধরতো। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, "আর তোমাদের মধ্যে যারা শনিবার দিবসে সীমালংঘন করেছিল সে সম্পর্কে তোমরা নিশ্চয় ভাল অবগত; তখন আমি তাদের বললাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও"।[১৩]

রসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমরা কৌশলে এমন পাপ কাজ করো না যা করেছিল ইহুদি জাতি। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট কৌশলে হালাল করে নিয়েছিল।[১৪] জীবনধারণের উপায়-উপকরণ এবং উপার্জনের জন্য ইসলাম ব্যবসাকে শুধু হালাল[১৫] ঘোষণা করেনি বরং এ পেশাকে মহান কাজ বলে প্রশংসা করেছে।[১৬] এ কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো যদি মানুষের কল্যাণের জন্য করা হয় তবে তা হালালের পর্যায়ে গণ্য হবে।

ইসলামী শরীয়তে ব্যবসা-বাণিজ্য তথা ক্রয়-বিক্রয় এমনই একটি বিষয় যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সন্তুষ্টি আবশ্যক।[১৭] এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ"।[১৮]

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

১১. আল-কুরআন, ৫:৬ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج

১২. ড. খালিদ ইবনু আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

১৩. আল-কুরআন, ২ : ৬৫ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين

১৪. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, অনু. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ৫০

১৫. আল-কুরআন, ২:২৭৫ وأحل الله البيع وحرم الربا

১৬. ইউসুফ আল-কারযাভী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩

১৭. বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়া*, অ. বি. খ. ৬, পৃ. ২৯৬

১৮. আল-কুরআন, ৪:২৯

সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতি অনুযায়ী সম্পাদিত হয়। তাতে কারো মধ্যস্থতা থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে অথবা একজন অজ্ঞ, অসতর্ক অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম হয়, তাহলে সে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্য কাউকে পরামর্শক বা দালাল নিয়োগ দিতে পারে।

দালালির পদ্ধতি

নবী স.-এর নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে দালালির বিষয়টি আজকের মতো এতো বৃহৎ পরিসরে ছিল না। সে কারণে লোকেরা একে অন্যের সাথে নানাভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য বা তাদের ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করতো।[১৯] দালালির বিষয়টি ঠিক তখনই আসত যখন ক্রেতা বা বিক্রেতা ধোঁকায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো।

কেনা-বেচার মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য খিয়ারুশ শর্ত (পণ্য ক্রয়ের স্বাধীনতা) শরীয়ত অনুমোদিত। তাদের উভয়ের জন্য তিন দিন অথবা তিন দিনের কমের খিয়ার থাকবে। আর এ ব্যাপারে দলীল হল ঐ হাদীস যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, মুনকিজ ইবনে আমর আল-আনসারী রা. বেচা-কেনায় ঠক খেতেন। তখন নবী করীম স. তাকে বললেন, যখন তুমি বেচা-কেনা করবে তখন বলবে, আমাকে ধোঁকা দিবে না। আর আমার জন্য তিন দিনের খিয়ার থাকবে।[২০]

এখানে যখন তাকে তিন দিনের অবকাশ দেয়া হবে তখন সে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকায় পতিত না হয়ে তৃতীয় পক্ষের কাছে পরামর্শ গ্রহণ করবে। অথবা ক্রেতা এমন মাল ক্রয় করতে ইচ্ছুক যে বিষয়ে সে খুব ভাল জানে না। তখন সে এমন একজন অভিজ্ঞ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

১৯. ড. খালিদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মুসলিহ, *আল-হাওয়াফিয আত-তিজারিয়্যা আত-তাসবীকিয়্য*, বৈরূত: দারু ইবনিল জাওযী, ১৪২৬, পৃ. ২৬৬

২০. ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনানু*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ: আল-হিজর আলা ইউফসিদু মালাহু, বৈরূত: দারুল-ফিকর, ২০০৩

عن محمد بن إسحق عن محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة وكان لا يزال يغبن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له إذا أنت بايعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها

ব্যক্তিকে খুঁজবে যে ঐ পণ্য সম্পর্কে খুব ভাল জানে এবং কোন কিছুর বিনিময়ে তাকে সে পরামর্শ দেবে। অথবা কোন জিনিস কেনার আগেই সে পরামর্শক বা প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করবে। অথবা বাজারে ভ্রাম্যমাণ ব্যক্তিরাও টাকার বিনিময়ে ক্রেতা বা বিক্রেতা অথবা উভয়ের জন্য দালালি করতে পারবে, যেমনটা আমরা গরু-ছাগলের হাটে দেখতে পাই।

দালালির উদ্দেশ্য

আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে এমনই প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন যে, তারা একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির যা দরকার তা একা যোগাড় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য মানুষ পরস্পরকে সহযোগিতা করে থাকে। নবী করীম স.-এর সময়কালে আরব সমাজে নানারকম ক্রয়-বিক্রয় ও পারস্পরিক লেনদেন চলছিল। এরপর তিনি ইসলামী শরীয়তের অনুকূল ব্যবস্থা ও কার্যাদি চালু করলেন, আর ইসলাম পরিপন্থী লেনদেন পদ্ধতিগুলোকে হারাম ঘোষণা করলেন। আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, ব্যবসার কাজে দালালি করা হলে তাতে কোন দোষ নেই। কেননা তা এক প্রকার পথ প্রদর্শন, ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে যোগাযোগ স্থাপন এবং মাধ্যম হওয়ার ব্যাপার। এ কারণে উভয় পক্ষই উপকৃত হয়।[২১] উভয় পক্ষই নিজেদের কাজে অনেক সুবিধা হয় আর এটা তো পারস্পরিক কল্যাণের বিষয়ও বটে। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা কল্যাণ ও খোদাভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর"।[২২]

বর্তমানকালে আমদানি-রফতানি ব্যবসায় অথবা পাইকারি ব্যবসায়ীদের জন্য দালালদের বা কোন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে ঐ প্রয়োজন আরো তীব্রতর। সে কারণে আধুনিক যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যে দালালি বা মধ্যস্থতার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। সুতরাং দালালির উদ্দেশ্য যদি সামাজিক কল্যাণ ও পারস্পরিক সহযোগিতা হয় তাহলে তা আরও বেশি জরুরী।[২৩]

ব্যবসা-বাণিজ্যে দালালির প্রভাব

ইসলামী শরীয়ত সর্বদা বাজারে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার পক্ষে। আর এ কারণে যে সকল বিষয় বাজারের স্বাভাবিক অবস্থায় প্রভাব ফেলে এবং বাজারে কৃত্রিম সংকট

---

২১. ইউসুফ আল-কারযাভী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫২

২২. আল-কুরআন, ৫:২ وتعاونوا على البر والتقوى

২৩. হাফিজ ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, বৈরুত: দারু তাইয়্যেবাতু আন-নাশর ওয়া আত-তাওযী, তা. বি. খ. ২, পৃ. ৩১০

সৃষ্টি করে ইসলামী আইন তাকে স্থগিত রাখে অথবা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনা কারণে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া ইসলামী শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা ইসলামে স্বীকৃত নয়। জিনিসের দরদাম উৎপাদনের সাথে সঙ্গতি রেখে কম-বেশী হতে পারে। তাই নির্দিষ্টভাবে জিনিসের মূল্য বেঁধে দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ স. বলেন, "এক লোক অভিযোগ করল, হে আল্লাহর রসূল! দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই আপনি আমাদের জন্য তার মূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন রসূলুল্লাহ স. বললেন, মহান আল্লাহই দ্রব্য মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন, তিনি তা বৃদ্ধি করেন এবং কমান আর তিনিই রিযিক প্রদান করেন"।[২৪]

অন্য আরো একটি হাদিসে এসেছে- "প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণকারী হলেন আল্লাহ তাআলা। তিনিই মূল্য বৃদ্ধি করেন আবার তিনিই বাজার মূল্য সস্তা করেন। রিজিকদাতা তিনিই। আমি তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে চাই এমন অবস্থায় যে, কোন রকমের জুলুম, রক্তপাত বা ধন-মালের অপহরণ ইত্যাদি দিক দিয়ে আমার ওপর কেউ দাবিদার থাকবে না"।[২৫]

দালালির যেমন ইতিবাচক দিক আছে ঠিক তেমনি দালালির ক্ষেত্রে অসততার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিরূপ প্রভাবও পড়তে পারে। যদি দালালি বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি করে কিংবা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে তবে ইসলাম তাতে অনুমোদন দেয় না। যেমন- ইমাম ইবনে তাইমিয়া একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে কোন দালাল থাকবে না। আর এটা রসূলুল্লাহ স.-এর পক্ষ থেকে নিষেধ। কেননা তাতে ক্রেতাগণের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। আর যখন মুকিম বা স্থায়ী ব্যক্তি কোন আগন্তুক ব্যক্তির পণ্য বিক্রয় করার জন্য প্রতিনিধিত্ব করে যা কেনার জন্য মানুষ তার শরণাপন্ন হয়, তখন ক্রেতা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কেননা আগন্তুক ব্যক্তি তো বাজার

---

[২৪]. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান্*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, খ. ৪

قال الناس يارسول الله غلا السعر فسعرلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله

هو المسعر القابض الباسط الرازق-

[২৫]. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৪, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : মান কারাহা আইয়ুসায়েরা।

عن أبى سعيد قال : غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : لو

قومت يارسول الله قال : (إنى لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبنى أحد منكم بمظلمة ظلمته

দর সম্পর্কে জানে না। অতপর রসূলুল্লাহ স. বললেন, "তোমরা মানুষদের অবকাশ দাও যাতে মহান আল্লাহ তাদের একে অন্যের মাধ্যমে রিজিকের ব্যবস্থা করেন"।[২৬]

দালালি ও ইসলামী শরীয়া

ইসলাম সর্বদা মানব কল্যাণে সহজতর ও কল্যাণমুখী বিষয় বিবেচনায় রেখে দালালির মতো বিষয়ের বৈধতা প্রদান করেছে। ইসলামী শরীয়তে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সকল আচরণকে বিচার করা হয় তার মধ্যে এমন কতগুলো স্বভাব আছে যা বিবেকের কাছে পরিত্যাজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সকল অসৎ গুণাবলির প্রয়োগ নিষিদ্ধ যা মানুষের লেনদেনকে কঠিন করে তোলে, দালালির ক্ষেত্রেও তা পরিত্যাজ্য।[২৭] ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বর্তমানে অস্তিত্ব নেই এমন জিনিস ক্রয়-বিক্রয় যেমন নাজায়েয ঠিক তেমনি দালাল নিয়োগের মাধ্যমে কৌশলে এমন ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করাও নাজায়েয।

অনুরূপভাবে দালাল অদৃশ্য বস্তুর বা তার মূল্যের প্রস্তাবও প্রদান করতে পারে না। কেননা তাতে অদৃশ্য বস্তুর মূল্য ব্যাপকভাবে কম বা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ক্রেতা বা বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[২৮] পূর্বে কোন দ্রব্য দেখে পরে তা পুনরায় নিজে না দেখে দালাল নিয়োগের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় করা ইসলামী শরীয়তে একটি বৈধ পন্থা। এটা এজন্য যে, ক্রেতা যেন দ্রব্যের বর্তমান অবস্থা জানতে পারে, কেননা দ্রব্যের অবস্থার পরিবর্তনের কারণে ক্রেতার জন্য সে দ্রব্য আগের দাম বা চুক্তি অনুযায়ী কেনা আবশ্যক থাকে না। পাশাপাশি মূল্য নির্ধারণ না করেও উকিলের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় ইসলামী শরীয়তে বৈধ।[২৯] এছাড়া দালালের মনে চুরির মনোভাব থাকতে পারবে না এবং সে মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধোঁকার আশ্রয় নেবে না।[৩০]

---

২৬. ইমাম ইবনু তাইমিয়া, *মু'জামুল ফাতাওয়া*, আল-কাহেরা: মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া, তা. বি., খ. ৬, পৃ. ৩২৫

لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارٌ وَهَذَا نَهْيٌ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الْمُشْتَرِينَ فَإِنَّ الْمُقِيمَ إذَا تَوَكَّلَ لِلْقَادِمِ فِي بَيْعِ سِلْعَةٍ يَحْتَاجُ النَّاسُ إلَيْهَا وَالْقَادِمُ لَا يَعْرِفُ السِّعْرَ ضَرَّ ذَلِكَ الْمُشْتَرِيَ ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " { دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ } "

২৭. মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী, *নায়লুল আওতার*, বৈরুত: দারুল যীল, ১৯৮৩, খ. ৫, পৃ. ৩৩৫

২৮. প্রাগুক্ত

২৯. আলী হায়দার, *দুরারুল হুকাম শারহু মুজিল্লাতিল আহকাম*, লেবানন: দারুল ফিকর, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ৬০৯

৩০. ইউসুফ আল-কারযাভী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৯

ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা দালালি বা মধ্যস্থতা করে তারা অনেক সময় মিথ্যা তথ্য দিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতাকে প্রতারিত করে যা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে এসেছে– "একবার রসূলুল্লাহ স. এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, যে খাদ্য-শস্য বিক্রি করছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: কিভাবে বিক্রি করছো? তখন সে ব্যক্তি তাঁর নিকট তা বর্ণনা করে। ইত্যবসরে তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হয় যে, আপনি আপনার হাত ঐ খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে ঢুকিয়ে দিন। তখন তিনি তাঁর হাত খাদ্যশস্যের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দেখতে পান যে, তার ভিতরের অংশ ভেজা। তখন রসূলুল্লাহ স. বলেন, সে আমাদের দলর্ভুক্ত নয়, যে প্রতারণা করে"।[৩১] ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দালালি প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ স. জনৈক ব্যক্তিকে পাত্রের উপরে শুকনা এবং ভেতরে ভেজা দ্রব্য রাখায় বিক্রেতাকে তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা নাজাশ করো না।[৩২]

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নাজাশ (النجش) করা মাকরূহ। নাজাশ অর্থ হলো, ক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয় বরং মূল্য বাড়ানোর জন্য বেশি করে দাম বলা অথবা দ্রব্য চালানোর উদ্দেশ্যে অন্যের সামনে দ্রব্যের অহেতুক প্রশংসা করা। এভাবে মূল্য বাড়ানোর জন্য দর-দাম করা মাকরূহ। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি পণ্যের বাজার দাম বলার পরও এরূপ করা হয়। পক্ষান্তরে মালের বাজার মূল্য বলার আগে যদি কেউ এরূপ অহেতুক প্রশংসা করে তবে তা মাকরূহ হবে না।[৩৩] এভাবে মূল্য বাড়ানোর জন্য মিথ্যা[illegible] দর-দাম করতে রসূলুল্লাহ স. নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা ক্রেতাকে প্রতারিত করে মূল্য বাড়ানোর জন্য দাম সাব্যস্ত করবে না। উল্লেখ্য, বাংলায় এ ধরনের কর্মতৎপরতাকে দালালী বলা হয়। রসূলুল্লাহ স. বেচা-কেনায় (ধোঁকার উদ্দেশ্যে) দালালী করতে নিষেধ করেছেন।[৩৪] ক্রেতা-

---

৩১. ইমাম নববী র., *রিয়াদুস সালেহীন,* ভাষান্তর: মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, খ. ৪, ঢাকা: ইসলামিয়া কুরআন মহল, ২০০১, পৃ. ৬৭

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فساله كيف تبيع فاخبره فاوحى اليه ان ادخل يدك فيه فادخل يده فيه فاذا هو مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشى – باب فى النهى عن الغش–

৩২. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-বুয়ু, খ. ৭, পৃ. ২৫৮

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن النجش

৩৩. সম্পাদনা পরিষদ, *ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ৭৩

৩৪. ইমাম ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনী, *আস-সুনান,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, খ. ২, পৃ. ২৮৯ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ

বিক্রেতা পরস্পর মিলে কোন বস্তুর দাম সাব্যস্ত করেছে, কিন্তু এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এ অবস্থায় অন্য ব্যক্তির এর উপর দর করা মাকরূহ। রসূলুল্লাহ স. বলেন, "কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে, আর তার ভাইয়ের দরদামের উপর দরদাম না করে"।[৩৫]

বহিরাগত ব্যবসায়ীদের শহরে প্রবেশ করার পূর্বে আগ বাড়িয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে মালামাল ক্রয় করা মাকরূহ, যদি এতে তাদের ক্ষতি হয় বা আমদানিকারকদের নিকট পণ্যদ্রব্যের স্থানীয় বাজার মূল্য অস্পষ্ট রাখা হয়। মানুষের ক্ষতি ও ধোঁকার কারণে এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরূহ। হাদীসে এ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে, নবী করীম স. বহিরাগত আমদানিকারকের সাথে সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছেন। কেউ যদি পণ্য মালিকের সাথে আগাম সাক্ষাৎ করে এভাবে কোন পণ্য খরিদ করে তবে পণ্যের মালিক বাজারে আসার পর তার পূর্ব বিক্রি বাতিল করার ইখতিয়ার থাকবে।[৩৬]

যদি এতে মানুষের ক্ষতি না হয় এবং ধোঁকার আশ্রয় গ্রহণ না করা হয় তবে এভাবে ব্যবসা করাতে কোন দোষ নেই।[৩৭] দুর্ভিক্ষের সময় শহরবাসী লোকেরা যদি লোভের বশবর্তী হয়ে গ্রামবাসী লোকদের পক্ষ হয়ে দালালী সেজে মালামাল বিক্রি করে এবং এতে শহরবাসী লোকদের কষ্ট বা ক্ষতি হয় তবে এ ক্রয়-বিক্রয় মাকরূহ হবে। যদি দুর্ভিক্ষের অবস্থা না হয় এবং মানুষের কষ্ট না হয় তবে মাকরূহ হবে না।[৩৮]

গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বেচা-কেনা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. বলেন, স্থানীয় লোকজন বহিরাগতদের পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় করবে না। তোমরা লোকদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাদের একজন থেকে অপরজনকে রিযক দান করবেন। ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. স্থানীয় লোকদের বহিরাগতদের পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী

---

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه

৩৬. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনানু আবি দাউদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭, খ. ৪, পৃ. ৩৯০ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق قال أبو علي سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيرا منه بعشرة

৩৭. সম্পাদনা পরিষদ, *ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

৩৮. ড. মোঃ মাসুদ আলম, *ইসলামের বাণিজ্যনীতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, (অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি. থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: এপ্রিল-২০১০, পৃ. ৯২

বলেন, আমি আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, বহিরাগতদের পক্ষে স্থানীয় লোকদের বেচাকেনার অর্থ কি? তিনি বললেন: স্থানীয় লোকজন যেন দালাল না সাজে।[৩৯]

দালাল অথবা ক্রেতা-বিক্রেতার কোন একজন যদি ব্যবসা-বাণিজ্যে ধোঁকার আশ্রয় নেয় তাহলে তার এই কৌশল হারাম হবে কিনা অথবা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বাতিল হবে কিনা এ বিষয়ে ইমামগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হাম্বলী, মালিকী ও শাফেঈগণের মতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে এ ধরনের কর্মকৌশল অবলম্বন করা হারাম। তারা আরো বলেন, এ বিষয়ে আল-কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে।[৪০]

আব্দুল্লাহ ইবনে আউফ র. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বাজারে এসে বলল, আমি এ দ্রব্য এত দামে অমুকের কাছে বিক্রি করেছি অথচ সে দ্রব্যটি বিক্রি করেনি।[৪১] এছাড়া ইবনে উমর থেকে বর্ণনা রয়েছে ও যেখানে রসূলুল্লাহ স. ধোঁকা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে আবু হুরায়রা ও ইবনে উমরের আরো একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

পক্ষান্তরে, হানাফী মাযহাব ও শাফেঈ মাযহাব মতে ব্যবসা-বাণিজ্যে ধোঁকার আশ্রয় নেয়া পাপ হলেও তা ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করে না। কেননা আলিমগণ বলেন, ক্রয়-বিক্রয় যেহেতু একটি চুক্তি আর চুক্তির মাঝে ধোঁকা তার অস্তিত্বকে নষ্ট করে না। বাজার ছাড়াও বাজারের বাইরে দালালি হতে পারে। যেমন গ্রামবাসীরা যখন শহরে পণ্য বিক্রি করতে আসে তখন রাস্তার মাঝে দালালি করা একটি প্রচলিত নিয়ম। এটা এভাবে যে, সে বলবে, আমি বাজারের বেশি দামে তোমাকে বিক্রি করিয়ে দেব। আর তুমি তার বিনিময়ে অতিরিক্ত অংশ থেকে আমাকে এত এত পরিমাণ দেবে।

ইমাম আওযায়ী, আবু হানিফা, মুজাহিদুর প্রমুখের মতে এরূপ করা শরীয়তে বৈধ। যেমন হাদীসে এসেছে- ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তাঁরা রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে শহরের বাইরে এসে রাস্তায় পণ্য ক্রয় করতেন, আর এজন্য গ্রাম থেকে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে আসা লোকদের রাস্তায় বাধাদান করতে পারে এবং তারা (আগত

---

৩৯. ইমাম ইবনে ইয়াজীদ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯

عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

৪০. আল-কুরআন, ৩ : ৭৭ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

৪১. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, তাফসীর অধ্যায়, বাবু عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع إن الذين يشترون بعهد الله

বিক্রেতা) তা বিক্রয় করার আগেই তাদের কাছ থেকে কিনে নেয়, অতপর তারা সে পণ্য বাজারে নিয়ে যায়।[৪২]

ইমাম বুখারী র. লিখেছেন, ইবনে শিরীন, আতা, ইবরাহীম, হাসান প্রমুখের মতে দালালির জন্য মজুরি গ্রহণ দোষের কিছু নয়। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যদি একজন অপরজনকে বলে, এ কাপড়টা বিক্রি করে দাও, অতিরিক্ত যা পাওয়া যাবে তা তোমার। তাহলে তা সম্পূর্ণ জায়েয অথবা লাভ কম-বেশি ভাগ করে নেয়াও দোষের নয়।

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দালালী করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা মৌল আক্‌দের হিসেবে নাজায়েয। কিন্তু প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এবং দেশীয় রেওয়াজ এর ভিত্তিতে ফকীহগণ একে জায়েয বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা এও বলেছেন, যেভাবে এক পক্ষের নিকট থেকে দালালী গ্রহণ জায়েয অনুরূপভাবে দুই পক্ষের নিকট থেকেও দালালী গ্রহণ জায়েয।[৪৩]

উল্লেখ্য, দালালীর পরিমাণ কখনই এমন হওয়া উচিত নয় যাতে ক্রেতা-বিক্রেতা যে কারো অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঠকিয়ে বা প্রতারণা করে দালালি গ্রহণ করা বৈধ নয়। এ বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করে মহানবী স. বেচা-কেনায় (ধোঁকার উদ্দেশ্যে) দালালি করতে নিষেধ করেছেন।[৪৪]

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের মত একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে সেই সহযোগিতার ক্ষেত্রটি হতে হবে ধোঁকা ও প্রতারণা মুক্ত। কেবল মুনাফার লোভে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন, অপকৌশল অবলম্বন কিংবা প্রতারণা করে দালালি করা ইসলামে বৈধ নয়। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার লেনদেনকে সহজ করার জন্য উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করা ইসলামে বৈধ বলে স্বীকৃত।

---

৪২. ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আল-বুয়ু, *প্রাগুক্ত*, حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ

৪৩. ড. মোঃ মাসুদ আলম, *ইসলামের বাণিজ্যনীতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ,* (অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি. থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: এপ্রিল-২০১০, পৃ. ১১২-১১৩

৪৪. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কায়রো: দারুল হাদীস, ১৯৯৪ খ. ৫, পৃ. ৪২৪ عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكن له سمسارا

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার নিয়মাবলি

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দুই কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় কিবোর্ড ব্যবহার করে (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2000) টাইপ / ফন্ট Sutonny MJ ব্যবহার করতে হবে। কাগজের সাইজ A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে : উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১.৬৫ ইঞ্চি, বামে ১.৬ ইঞ্চি। প্রবন্ধের সফ্ট কপি সংস্থার ই-মেইল ঠিকানায় পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে লেখকের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রবন্ধের সাথে লেখককে/দের এ মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে-

ক. জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/ তাঁরা;

খ. প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো জার্নালে মুদ্রিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য তা অন্য কোনো জার্নালে জমা দেয়া হয়নি। উল্লেখ্য যে, প্রত্যায়নপত্র ছাড়া কোনো প্রবন্ধ গৃহীত হবে না।

গ. প্রবন্ধে প্রকাশিত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক/গবেষক জার্নালের ২ (দুই) টি কপি এবং ৫ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. প্রবন্ধ বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণে (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান) রচিত হবে। তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। লেখক কোন বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। তথ্যনির্দেশের ক্ষেত্রে শব্দের উপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন[১]) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থ ও জার্নাল থেকে তথ্যসূত্র নিম্নোক্ত ভাবে লিখতে হবে।

যেমন– গ্রন্থ :

ক. কাজী এবাদুল হক, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ.২৯

খ. ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ইসমু মানিইয যাকাত, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১১০

গ. যিকরা আহা হুসাইন, *জামহূরিয়াতু মিসর আল-আরাবিয়্যাহ*, ওয়ারাতুস সাকাফা, আল-কাহেরা : আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৭৭, পৃ. ১০৩

প্রবন্ধ ঃ

* Dr. Taslima Monsoor, *Dissolution of Marriages on Test A Study of Islamic Family Law and Women, Journal of the Faculty of Law*, University of Dhaka, Volume:15, Number:1, June 2004, p. 26

৬. মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। *গ্রন্থ ও পত্রিকার নাম বাঁকা অক্ষরে (Italic) হবে যেমন, গ্রন্থ ঃ বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন;* পত্রিকা : *Journal of Islamic law and judiciary.*

৭. আল-কুরআনুল করীম ও হাদীসসমূহের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত অনুবাদ অনুসরণ করে চলতি রীতিতে রূপান্তর করতে হবে, তবে রেফারেন্সদানের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের (আরবি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজি যে ভাষায় হোক তা অপরিবর্তিত রেখে) টেক্সট দিতে হবে। Secondary source এর উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য নয়। আল-কুরআনুল করীম ও হাদীসের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে। কুরআনের উদ্ধৃতি হবে এভাবে– আল-কুরআন, ২:১৫। হাদীসের উদ্ধৃতি হবে এভাবে– ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় (ابواب/كتاب):.., অনুচ্ছেদ (باب):........, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান:---, প্রকাশকাল---, খ.--, পৃ.--। ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ দিতে হবে।

৮. প্রকাশিত প্রবন্ধের ব্যাপারে কারো ভিন্ন মত থাকলে যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

৯. প্রবন্ধের শুরুতে 'সারসংক্ষেপ' এবং শেষে 'উপসংহার' অবশ্যই দিতে হবে।

১০. কুরআন ও হাদীসের আরবী Text প্রতি পৃষ্ঠার নিচে ফুটনোটে এবং অনুবাদ মূল লেখার সাথে দিতে হবে।

প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকানা

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

ইসলামী আইন ও বিচার

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন :০২-৭১৬০৫২৭, ০১৭১২-০৬১৬২১, ০১৭১৭-২২০৪৯৮

ই-মেইল: islamiclaw_bd@yahoo.com. www.ilrcbd.org

এক নজরে
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
এর কার্যক্রম

১. রিসার্চ প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইন
খ. মুসলিম পারিবারিক আইন
গ. নারী, শিশু ও মানবাধিকার
ঘ. ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস
ঙ. ইসলামী আইন সম্পর্কে ভ্রান্তি নিরসন
চ. ইসলামী আইনের কল্যাণ ও কার্যকারিতা উপস্থাপন

২. লিগ্যাল এইড প্রজেক্ট

ক. পারিবারিক বিরোধ নিরসনে সালিশ
খ. আদালতের বাইরে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি
গ. অসহায় মজলুমদের আইনী সহায়তা
ঘ. নির্যাতিতা নারী ও শিশুদের আইনী সহায়তা
ঙ. ইসলামের পক্ষে আইনী প্রতিরোধ

৩. সেমিনার প্রজেক্ট

ক. আন্তর্জাতিক আইন সেমিনার
খ. জাতীয় আইন সেমিনার
গ. মাসিক সেমিনার
ঘ. মতবিনিময় সভা
ঙ. গোল টেবিল বৈঠক

৪. জার্নাল প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)
খ. ইসলামিক ল' এন্ড জুডিশিয়ারী (ষান্মাসিক)
গ. আরবী জার্নাল (ষান্মাসিক)
ঘ. মাসিক পত্রিকা
ঙ. বুলেটিন

৫. বুক পাবলিকেশন্স প্রজেক্ট

ক. মৌলিক আইন গ্রন্থ
খ. অনুবাদ আইন গ্রন্থ
গ. আইনের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা
ঘ. ইসলামী আইন কোষ
ঙ. ইসলামী আইন বিশ্বকোষ

৬. লেখক প্রজেক্ট

ক. বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক লেখক ফোরাম
খ. আইনজীবী ভিত্তিক লেখক ফোরাম
গ. মাদরাসা ভিত্তিক লেখক ফোরাম
ঘ. লেখক ওয়ার্কশপ
ঙ. লেখক সম্মেলন

৭. লাইব্রেরী প্রজেক্ট

ক. কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ
খ. ফিক্‌হ ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ
গ. আইন ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ
ঘ. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ
ঙ. ইসলামের ইতিহাস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ

৮. উন্নয়ন প্রজেক্ট

ক. আইন কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা
খ. আইন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
গ. আধুনিক অডিটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা
ঘ. ই-লাইব্রেরী
ঙ. আইন ওয়েব সাইট

ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার

গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর গ্রাহক/এজেন্ট হতে চাই। আমার ঠিকানায় ....কপি পাঠানোর অনুরোধ করছি।

নাম ঃ..

ঠিকানা ঃ..

....

বয়স.................. পেশা...

ফোন/মোবাইল : ....সহজলভ্য মাধ্যম :

ডাক/কুরিয়ার : ফরমের সঙ্গে ....টাকা সংস্থার নামে মানি অর্ডার/টিটি/ডিডি করলাম/অথবা নিম্নলিখিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিলাম।

কথায় টাকা ....

স্বাক্ষর

গ্রাহক/এজেন্ট

ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে

সম্পাদক

ইসলামী আইন ও বিচার

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০২-৭১৬০৫২৭, ০১৭১৭-২২০৪৯৮, ০১৭১২-৬৮১৬২১

E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com. www.ilrcbd.org

সংস্থার একাউন্ট নং

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

গঋঅ-১১০৫১ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, পল্টন শাখা, ঢাকা

ভি.পি ও কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়।

ডাক বা কুরিয়ার চার্জ সংস্থা বহন করে।

এজেন্ট হওয়ার জন্য ৫ কপির অর্ধেক মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হবে।

গ্রাহক হওয়ার জন্য ন্যূনতম এক বছর তথা ৪ সংখ্যার মূল্য বাবদ ৪০০/- টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়।

৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না। ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন

২০ কপির উর্ধ্বে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

⇨ ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ১০০ X ৪ = ৪০০/-

⇨ ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) = ১০০ X ৮ = ৮০০/-

⇨ ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(বার সংখ্যা) = ১০০ X ১২ = ১২০০/-

REG : NO : DA -6100, ISLAMI AIN O BICHAR : JANUARY-MARCH : 2012

Design : An-Noor